রক্ষা করি। (কেননা, আল্লাহ্‌র গযবে পতিত হওয়ার চেয়ে বড় লাঞ্ছনা আর কিছু নেই।) নিশ্চয় তোমার প্রভু, তিনিই সর্বশক্তিমান পরাক্রমশীল (যাকে ইচ্ছা তিনি শাস্তি দান করেন, যাকে খুশি রক্ষা করেন।)

আর ভয়ঙ্কর (এক) গর্জন [অর্থাৎ হযরত জিবরাঈল (আ)-এর হাঁক] পাপিষ্ঠদেরকে পাকড়াও করল। (যার) ফলে তারা (অতি) প্রত্যূষে নিজ নিজ গৃহে উপুড় হয়ে পড়ে রইল। (তারা চিরতরে এমন নীরব নিস্তব্ধ হয়ে গেল, যেন তারা কোনদিনই তথায় ছিল না।) জেনে রাখ, সামূদ জাতি তাদের পরওয়ারদিগারকে অস্বীকার করেছিল। আরো শুনে রাখ, (পরিণামে) তারা (আল্লাহর) রহমত হতে দূরীভূত (ও গযবে নিপতিত হয়েছে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা হুদের ৫০ হতে ৬০ পর্যন্ত ১১ আয়াতে বিশিষ্ট পয়গম্বর হযরত হুদ (আ)-এর আলোচনা করা হয়েছে। তাঁর নামেই অত্র সূরার নামকরণ হয়েছে। অত্র সূরার মধ্যে হযরত নূহ (আ) হতে হযরত মূসা (আ) পর্যন্ত সাতজন আম্বিয়ায়ে কিরাম (আ) ও তদীয় উম্মতগণের কাহিনী কোরআন পাকের বিশেষ বাচনভঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে। এর মধ্যে উপদেশ ও শিক্ষামূলক এমন তথ্যাদি তুলে ধরা হয়েছে, যা যে-কোন অনুভূতিশীল মানুষের অন্তরে ভাবান্তর সৃষ্টি না করে পারে না। তাছাড়া ঈমান ও সৎকর্মের বহু মূলনীতি এবং উত্তম পথনির্দেশ রয়েছে।

যদিও অত্র সূরার মধ্যে সাতজন পয়গম্বরের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু সূরার নামকরণ করা হয়েছে হযরত হুদ (আ)-এর নামে। এতে বোঝা যায় যে, এখানে হযরত হুদ (আ)-এর ঘটনার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

আল্লাহ্ পাক হযরত হুদ (আ)-কে আদ জাতির প্রতি নবীরূপে প্রেরণ করেছিলেন। দৈহিক আকার-আকৃতিতে ও শারীরিক শক্তি-সামর্থ্যের দিক দিয়ে 'আদ জাতিকে মানব ইতিহাসে অনন্য বলে চিহ্নিত করা হয়। হযরত হুদ (আ)-ও উক্ত জাতিরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। যেমন ঃ أَخَاهُمْ هُودًا 'তাদের ভাই হুদ'— শব্দে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, এত বড় বীর ও শক্তিশালী জাতি তাদের বিবেক ও চিন্তাশক্তি হারিয়ে ফেলেছিল। নিজেদের হাতে তৈরি প্রস্তরমূর্তিকে তারা তাঁদের মা'বুদ সাব্যস্ত করেছিল।

হযরত হুদ (আ) তাঁর কওমের নিকট যে দীনী দাওয়াত পেশ করেন, তার তিনটি মূলকথা প্রথম তিন আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

প্রথমত—তওহীদ বা একত্ববাদের আহবান এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন সত্তা বা শক্তিকে ইবাদত উপাসনার যোগ্য মনে করা বাতুলতা মাত্র। দ্বিতীয় হচ্ছে, আমি যে তাওহীদের দাওয়াত নিয়ে এসেছি, এজন্য জীবন উৎসর্গ করছি। তোমরা

চিন্তা করে দেখ তো, আমি এহেন কষ্ট-ক্লেশের পথ কোন্ স্বার্থে অবলম্বন করেছি? আমি তো এর বিনিময়ে তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না। আমার বস্তুগত কোন ফায়দা বা স্বার্থ হাসিল হচ্ছে না। এটা যদি আল্লাহ্র নির্দেশ এবং আমার দায়িত্ব না হতো, তাহলে তোমাদেরকে দাওয়াত দিতে ও সংশোধন করতে গিয়ে এত কষ্ট-ক্লেশ বরণ করার কি প্রয়োজন ছিল?

ওয়াজ-নসিহত ও দীনী দাওয়াতের পারিশ্রমিক ঃ কোরআন করীমে প্রায় সব নবী (আ)-র যবানীতে এ উক্তি ব্যক্ত হয়েছে যে, "আল্লাহ্র দীনের দাওয়াত পৌঁছানোর বিনিময়ে তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না।" এতে বোঝা যায় যে, দীনী-দাওয়াত ও তাবলীগের কোন পারিশ্রমিক গ্রহণ করা হলে তা ফলপ্রসূ হয় না। বাস্তব অভিজ্ঞতাও সাক্ষ্য দেয় যে, যারা ওয়াজ-নসিহত করে পারিশ্রমিক গ্রহণ করে, তাদের কথা শ্রোতাদের অন্তরে কোন তাসির করতে পারে না।

তৃতীয় কথা হচ্ছে, নিজেদের অতীত জীবনে কুফরী, শিরকী ইত্যাদি যত গোনাহ করেছ, সেসব থেকে আল্লাহ্র দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং ভবিষ্যতের জন্য ঐসব গোনাহ হতে তওবা কর। অর্থাৎ দৃঢ় সংকল্প ও প্রতিজ্ঞা কর যে, আগামীতে আর কখনো এসবের ধারেকাছেও যাবে না। যদি তোমরা এরূপ সত্যিকার তওবা ও ইস্তেগফার করতে পার, (তবে তার বদৌলতে পরকালের চিরস্থায়ী সাফল্য ও সুখময় জীবন তো লাভ করবেই,) অধিকন্তু দুনিয়াতেও এর বহু উপকারিতা দেখতে পাবে। দুর্ভিক্ষ ও অনাবৃষ্টির পরিসমাপ্তি ঘটবে, যথাসময়ে প্রচুর বৃষ্টিপাত হবে, যার ফলে তোমাদের আহার্য পানীয়ের প্রাচুর্য হবে, তোমাদের শক্তি-সামর্থ্য বর্ধিত হবে।

এখানে 'শক্তি' শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যার মধ্যে দৈহিক শক্তি এবং ধনবল ও জনবল সবই অন্তর্ভুক্ত। এতদ্দ্বারা জানা গেল যে, তওবা ও ইস্তেগফারের বদৌলতে ইহজীবনেও ধনসম্পদ এবং সন্তানাদির মধ্যে বরকত হয়ে থাকে।

হযরত হুদ (আ)-এর আহবানের জবাবে তাঁর দেশবাসী মূর্খতাসুলভ উত্তর দিল যে, আপনি তো আমাদেরকে কোন মু'জিযা দেখালেন না। শুধু মুখের কথায় আমরা নিজেদের বাপদাদার আমলের উপাস্য দেব-দেবীগুলোকে বর্জন করব না। এবং আপনার প্রতি ঈমানও আনব না। বরং আমরা সন্দেহ করছি যে, আমাদের দেবতাদের নিন্দাবাদ করার কারণে আপনার মস্তিষ্ক নষ্ট হয়ে গেছে। তাই আপনি এমন অসংলগ্ন কথা বলছেন।

তদুত্তরে হযরত হুদ (আ) পয়গম্বরসুলভ নির্ভীক কণ্ঠে জবাব দিলেন, তোমরা যদি আমার কথা না মান, তবে শোন, আমি আল্লাহ্কে সাক্ষী রেখে বলছি, আর তোমরাও সাক্ষী থাক যে, একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া তোমাদের সব অলীক উপাস্যদের প্রতি আমি রুষ্ট ও বিমুখ। এখন তোমরা ও তোমাদের দেবতারা সবাই মিলে আমার অনিষ্ট সাধনের, আমার উপর আক্রমণের চেষ্টা করে দেখ, আমাকে বিন্দুমাত্র অবকাশ দিও না।

এত বড় কথা আমি এ জন্য বলছি যে, আমি আল্লাহ্ তা'আলার উপর পূর্ণ আস্থা ও ভরসা রাখি, যিনি আমার এবং তোমাদের একমাত্র পালনকর্তা। ধরাধামে বিচরণশীল সকল প্রাণীই তাঁর মুঠোর মধ্যে। তার ইচ্ছা ও অনুমতি ছাড়া কেউ কারো কোন ক্ষতি করতে পারে না। নিশ্চয় আমার পরওয়ারদিগার সরল পথে রয়েছেন। অর্থাৎ যে ব্যক্তি সরল পথে চলবে, সে আল্লাহ্কে পাবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে সাহায্য করবেন।

সমগ্র জাতির মুকাবিলায় দাঁড়িয়ে এমন নির্ভীক ঘোষণা ও তাদের দীর্ঘদিনের লালিত ধর্মীয় ধ্যান-ধারণায় আঘাত হানা সত্ত্বেও এত বড় সাহসী ও শক্তিশালী জাতির মধ্যে কেউ তাঁর একটি কেশও স্পর্শ করতে পারল না। বস্তুত এও হযরত হুদ (আ)-এর একটি মু'জিযা। এর দ্বারা একে-তো তাদের এ কথার জবাব দেওয়া হয়েছে যে, আপনি কোন মু'জিযা প্রদর্শন করেন নি। দ্বিতীয়ত, তারা যে বলত, "আমাদের কোন কোন দেবতা আপনার মস্তিষ্ক নষ্ট করে দিয়েছে" তাও বাতিল করা হল। কারণ দেব-দেবীর যদি কোন ক্ষমতা থাকত, তবে এত বড় কথা বলার পর ওরা তাঁকে জীবিত রাখত না।

অতপর তিনি বলেন—তোমরা যদি এভাবে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করতে থাক, তবে জেনে রাখ, যে পয়গাম পৌঁছাবার জন্য আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে, আমি তা যথাযথভাবে তোমাদের নিকট পৌঁছিয়েছি। অতএব তোমাদের অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে যে, তোমাদের উপর আল্লাহ্র আযাব ও গযব আপতিত হবে, তোমরা সমূলে নিপাত ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আর আমার পরওয়ারদিগার তোমাদের স্থলে অন্য জাতিকে এ পৃথিবীতে আবাদ করাবেন। তোমরা যা করছ তাতে তোমাদেরই সর্বনাশ করছ, আল্লাহ্ তা'আলার কোন ক্ষতি করছ না। আমার পালনকর্তা সবকিছু লক্ষ্য রাখেন, রক্ষণাবেক্ষণ করেন। তোমাদের সব ধ্যান-ধারণা ও কার্যকলাপের তিনি খবর রাখেন।

কিন্তু হতভাগার দল হযরত হুদ (আ)-এর কোন কথায় কর্ণপাত করল না। তারা নিজেদের হঠকারিতা ও অবাধ্যতার উপর অবিচল রইল। অবশেষে প্রচণ্ড ঝড়-তুফান রূপে আল্লাহ্র আযাব নেমে এল। সাতদিন আটরাত যাবত অনবরত ঝড়-তুফান বইতে লাগল। বাড়ি-ঘর ধসে গেল, গাছপালা উপড়ে পড়ল, গৃহ-ছাদ উড়ে গেল, মানুষ ও সকল জীবজন্তু শূন্যে উত্থিত হয়ে সজোরে যমীনে নিক্ষিপ্ত হল, এভাবেই সুঠাম দেহের অধিকারী শক্তিশালী একটি জাতি সম্পূর্ণ ধ্বংস ও বরবাদ হয়ে গেল।

'আদ জাতির উপর যখন প্রতিশ্রুত আযাব নাযিল হয়, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর চিরন্তন বিধান অনুযায়ী হযরত হুদ (আ) ও সঙ্গী ঈমানদারগণকে সেখান থেকে সরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে আযাব হতে রক্ষা করেন।

'আদ জাতির কাহিনী ও আযাবের ঘটনা বর্ণনা করার পর অপরাপর লোকদের শিক্ষা ও সতর্কীকরণের জন্য ইরশাদ করেছেন যে, কওমে আদ আল্লাহ্র আয়াত ও নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করেছে, আল্লাহ্র রসূলগণকে অমান্য করেছে, হঠকারী

পাপিষ্ঠদের কথামত কাজ করেছে। যার ফলে দুনিয়াতে তাদের প্রতি গযব নাযিল হয়েছে এবং আখিরাতেও অভিশপ্ত আযাবে নিক্ষিপ্ত হবে।

এখানে বোঝা যায় যে, 'আদ জাতি ঝড়-তুফানের কবলে পতিত হয়েছিল। কিন্তু 'সূরা মুমিনুন'-এর বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, ভয়ঙ্কর গর্জনে তারা ধ্বংস হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে, হয়ত উভয় প্রকার আযাবই নাযিল হয়েছিল। প্রথমে ঝড়-তুফান শুরু হয়েছিল, চরম পর্যায়ে ভয়ঙ্কর গর্জনে তারা ধ্বংস হয়েছিল।

৬১ হতে ৬৮ পর্যন্ত ৮ আয়াতে হযরত সালেহ্ (আ)-র কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। যিনি 'আদ জাতির দ্বিতীয় শাখা 'কওমে সামূদ'-এর প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন। তিনিও তাঁর কওমকে সর্বপ্রথম তওহীদের দাওয়াত দিলেন। দেশবাসী তা প্রত্যাখ্যান করে বলল—"এ পাহাড়ের প্রস্তরখণ্ড হতে আমাদের সম্মুখে আপনি যদি একটি উষ্ট্রী বের করে দেখাতে পারেন, তাহলে আমরা আপনাকে সত্য নবী বলে মানতে রাযী আছি।"

হযরত সালেহ (আ) তাদেরকে এই বলে সতর্ক করলেন যে, তোমাদের চাহিদা মুতাবিক মু'জিযা প্রদর্শনের পরেও তোমরা যদি ঈমান আনতে দ্বিধা প্রকাশ কর, তাহলে কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার বিধান অনুসারে তোমাদের উপর আযাব নেমে আসবে, তোমরা সমূলে ধ্বংস হয়ে যাবে। এতদসত্ত্বেও তারা নিজেদের হঠকারিতা হতে বিরত হল না। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর অসীম কুদরতে তাদের চাহিদা মুতাবিক মু'জিযা জাহির করলেন। বিশাল প্রস্তরখণ্ড বিদীর্ণ হয়ে তাদের কথিত গুণাবলী সম্পন্ন উষ্ট্রী আত্মপ্রকাশ করল। আল্লাহ্ তা'আলা হুকুম দিলেন যে, এ উষ্ট্রীকে কেউ যেন কোনরূপ কষ্ট-ক্লেশ না দেয়। যদি এরূপ করা হয়, তবে তোমাদের প্রতি আযাব নাযিল হয়ে তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু তারা নিষেধাজ্ঞা অমান্য করল, উষ্ট্রীকে হত্যা করল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা কঠোরভাবে পাকড়াও করলেন। হযরত সালেহ্ (আ) ও তাঁর সঙ্গী ঈমানদারগণ নিরাপদে রক্ষা পেলেন। অন্য সবাই এক ভয়াবহ গর্জনে ধ্বংস হল। অত্র ঘটনায় বর্ণিত রয়েছে যে, হযরত সালেহ্ (আ)-র জাতি তাঁকে বলল ঃ قَدْ كُنْتَ فِيْنَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هٰذَا

অর্থাৎ তওহীদের দাওয়াত ও প্রতিমা পূজা থেকে আমাদের বারণ করার আগ পর্যন্ত আপনার সম্পর্কে আমরা উচ্চাশা পোষণ করতাম যে, আপনি আগামীতে আমাদের নেতৃত্ব দান করবেন। এর কারণ হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলা বাল্যকাল হতেই নবীগণকে যোগ্যতা ও উন্নত স্বভাব-চরিত্রের অধিকারী করে থাকেন। যার ফলে সবাই তাঁদেরকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করতে বাধ্য হতো, যেমন হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে নবুয়ত ঘোষণা করার পূর্বে সমগ্র আরববাসী তাঁকে সত্যবাদী ও বিশ্বাসী মনে করত, এবং 'আল-আমীন' উপাধিতে ভূষিত করেছিল। কিন্তু নবুয়তের দাবি ও মূর্তিপূজা থেকে বারণ করার সঙ্গে সঙ্গেই সেই সব লোক তার বিরোধিতা ও শত্রুতা শুরু করেছিল।

تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ অর্থাৎ তারা যখন আল্লাহ্‌র নিষেধাজ্ঞা লংঘন করে অলৌকিক উষ্ট্রীকে হত্যা করল, তখন তাদেরকে নির্দিষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হল যে, মাত্র তিনদিন তোমাদেরকে অবকাশ দেওয়া হল, এ তিনদিন অতিবাহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে।

তফসীরে কুরতুবীতে বর্ণিত হয়েছে যে, এ অবকাশের তিনদিন ছিল বৃহস্পতি, শুক্র ও শনিবার। রোববার প্রত্যূষে তাদের উপর আযাব নাযিল হল।

وَاَخَذَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ অর্থাৎ ঐ পাপিষ্ঠদেরকে এক ভয়ঙ্কর গর্জন এসে পাকড়াও করল। এ ছিল হযরত জিবরাঈল (আ)-এর গর্জন, যা হাজার হাজার বজ্রধ্বনির সম্মিলিত শক্তির চেয়েও ভয়াবহ। যা সহ্য করার ক্ষমতা মানুষ বা কোন জীবজন্তুর হতে পারে না। এরূপে প্রাণ কাঁপানো গর্জনেই সকলে মৃত্যুবরণ করেছিল।

অন্য আয়াতের মর্মার্থ থেকে বোঝা যায় যে, 'কওমে-সামূদ' ভয়ঙ্কর গর্জনে ধ্বংস হয়েছিল। অপর দিকে সূরা 'আ'রাফ'-এর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছেঃ فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ 'অতপর ভূমিকম্প তাদেরকে পাকড়াও করল।' এতে বোঝা যায় যে, ভূমিকম্পের ফলে তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। ইমাম কুরতুবী (র) বলেন যে, উভয় আয়াতের মর্মার্থে কোন বিরোধ নেই। হয়ত প্রথমে ভূমিকম্প শুরু হয়েছিল এবং তৎসঙ্গেই ভয়ঙ্কর গর্জনে সবাই ধ্বংস হয়েছিল।

وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَآ اِبْرٰهِيْمَ بِالْبُشْرٰى قَالُوْا سَلٰمًا ۭ قَالَ
سَلٰمٌ فَمَا لَبِثَ اَنْ جَآءَ بِعِجْلٍ حَنِيْذٍ ۝ فَلَمَّا رَآٰ اَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ
اِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً ۭ قَالُوْا لَا تَخَفْ اِنَّآ اُرْسِلْنَآ
اِلٰى قَوْمِ لُوْطٍ ۝ وَامْرَاَتُهٗ قَآئِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنٰهَا بِاِسْحٰقَ ۙ
وَمِنْ وَّرَآءِ اِسْحٰقَ يَعْقُوْبَ ۝ قَالَتْ يٰوَيْلَتٰٓى ءَاَلِدُ وَاَنَا عَجُوْزٌ وَّ
هٰذَا بَعْلِيْ شَيْخًا ۭ اِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ عَجِيْبٌ ۝ قَالُوْٓا اَتَعْجَبِيْنَ
مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ رَحْمَتُ اللّٰهِ وَبَرَكٰتُهٗ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ ۭ اِنَّهٗ
حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۝

(৬৯) আর অবশ্যই আমার প্রেরিত ফেরেশতারা ইবরাহীমের কাছে সুসংবাদ নিয়ে এসেছিল, তারা বলল—সালাম, তিনিও বললেন—সালাম। অতপর অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি একটি ভুনা করা বাছুর নিয়ে এলেন। (৭০) কিন্তু যখন দেখলেন যে, আহার্যের দিকে তাদের হস্ত প্রসারিত হচ্ছে না, তখন তিনি সন্দিগ্ধ হলেন এবং মনে মনে তাদের সম্পর্কে ভয় অনুভব করতে লাগলেন। তারা বলল—ভয় পাবেন না। আমরা লূতের কওমের প্রতি প্রেরিত হয়েছি। (৭১) তার স্ত্রীও নিকটেই দাঁড়িয়েছিল, সে হেসে ফেলল। অতপর আমি তাকে ইসহাকের জন্মের সুখবর দিলাম এবং ইসহাকের পরে ইয়াকুবেরও। (৭২) সে বলল—কি দুর্ভাগ্য আমার! আমি সন্তান প্রসব করব? অথচ আমি বার্ধক্যের শেষ প্রান্তে এসে উপনীত হয়েছি আর আমার স্বামীও বৃদ্ধ, এ তো ভারী আশ্চর্য কথা! (৭৩) তারা বলল—তুমি আল্লাহ্‌র হুকুম সম্পর্কে বিস্ময়বোধ করছ? হে গৃহবাসীরা, তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র রহমত ও প্রভূত বরকত রয়েছে। নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রশংসিত, মহিমময়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর আমার প্রেরিত ফেরেশতারা (মানবাকৃতি ধারণ করে) ইবরাহীম (আ)-এর কাছে [তদীয় পুত্র হযরত ইসহাক (আ) সম্পর্কে] সুসংবাদ নিয়ে এসেছিল। (যদিও তাঁদের আগমনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল কওমে লূতের উপর আযাব নাযিল করা), তাঁরা [উপস্থিত হওয়ামাত্র হযরত ইবরাহীম (আ)-কে] বলল—সালাম (অর্থাৎ আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হউক। তদুত্তরে হযরত) ইবরাহীম (আ)-ও তাদেরকে সালাম বললেন, (অর্থাৎ সালামের যথারীতি জবাব দিলেন, কিন্তু তিনি তাদের চিনতে পারলেন না; তাই সাধারণ আগন্তুক মানুষ মনে করলেন। অতপর) তিনি অল্পক্ষণের মধ্যেই একটি (হৃষ্টপুষ্ট) বাছুর ভুনা করে (তাদের মেহমানদারীর জন্য) নিয়ে এলেন, (এবং তাদের সম্মুখে রাখলেন।) কিন্তু তাঁরা যেহেতু ফেরেশতা ছিলেন, তাই আহার্য গ্রহণ করলেন না। হযরত ইবরাহীম (আ) যখন দেখলেন যে, সেই খাবারের দিকে তাঁদের হস্ত প্রসারিত হচ্ছে না, তখন তিনি সন্দিগ্ধ হলেন এবং মনে মনে তাঁদের সম্পর্কে ভয় অনুভব করতে লাগলেন। (যে, এরা কারা? আহার্য গ্রহণ করছে না কেন? তবে কি এদের কোন দুরভিসন্ধি রয়েছে? অথচ বাড়িতে আমিই একমাত্র পুরুষ, ধারেকাছে কোন আত্মীয়-স্বজনও নেই। এমনকি তিনি মনের খট্‌কা প্রকাশ করে বললেন إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ 'আমরা তোমাদেরকে ভয় করছি।') ফেরেশতাগণ বললেন, ভয় পাবেন না। [আমরা মানুষ নই, বরং ফেরেশতা। আপনার জন্য সুসংবাদ বহন করে এনেছি যে, আপনার ঔরসে বিবি সারার গর্ভে একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, যার নাম হবে ইসহাক (আ) এবং তাঁর পুত্র হবে ইয়াকুব (আ)। অত্র ভবিষ্যদ্বাণীকে সুখবর বলার কারণ, প্রথমত সন্তান লাভ করা খুশির বিষয়। দ্বিতীয়ত তখন হযরত ইবরাহীম (আ) ও বিবি সারা বার্ধক্যের চরম সীমায় উপনীত হয়ে-

ছিলেন, সে বয়সে সন্তান লাভের কোন আশা ছিল না। কাজেই, এরচেয়ে বড় সুসংবাদ আর কি হবে? যাহোক, হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁর নবীসুলভ জ্ঞানের দ্বারা উপলব্ধি করলেন যে, তাঁরা ফেরেশতা, নবীসুলভ জ্ঞান দ্বারা সঙ্গে সঙ্গে এও বুঝে গেলেন যে, প্রকৃতপক্ষে তাঁরা এ ব্যতীত আরো গুরুত্বপূর্ণ কোন কার্য সম্পাদনের জন্যই অবতরণ করেছেন। তাই তিনি জানতে চাইলেন فَمَا خَطْبُكُمْ 'আপনাদের প্রধান লক্ষ্য কি?' তদুত্তরে তারা বলল,] আমরা হযরত লূত (আ)-এর কওমের প্রতি প্রেরিত হয়েছি, (কুফরী করার শাস্তিস্বরূপ) তাদেরে নির্মূল করে দিতে। হযরত ইবরাহীম (আ) ও ফেরেশতাগণের মধ্যে এই কথোপকথন চলছিল। আর হযরত ইবরাহীম (আ)-এর স্ত্রী (বিবি সারা) নিকটেই কোথাও দণ্ডায়মান ছিলেন এবং শুনছিলেন। অতপর সন্তান লাভের সংবাদ শুনে আনন্দাতিশয্যে হেসে ফেললেন। কারণ, হযরত হাজেরার গর্ভে হযরত ইসমাইল (আ)-এর জন্মের পরে তাঁর মধ্যে সন্তান কামনা জাগ্রত হয়েছিল। তাজ্জব হয়ে কপালে হাত ঠেকালেন। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا অতপর আমি (ফেরেশতাদের মাধ্যমে পুনরায়) তাকে সুখবর দিলাম (হযরত) ইসহাক (আ)-এর জন্মগ্রহণের এবং ইসহাক (আ)-এর পরে তৎপুত্র হযরত ইয়াকুব (আ)-এর (জন্ম গ্রহণের, তখন) সে বলতে লাগল ঃ মরণ আর কি! আমি সন্তান প্রসব করব? অথচ আমি বৃদ্ধা আর আমার স্বামীও (উপবিষ্ট) রয়েছেন, একেবারে বৃদ্ধ। এ তো বড়ই আজব কথা। ফেরেশতাগণ বললেন, (নবীর পরিবারভুক্ত হওয়া এবং মু'জিযা ও অলৌকিক ঘটনাবলী বারবার দেখা সত্ত্বেও) তুমি কি আল্লাহ্র হুকুম সম্পর্কে বিস্ময় প্রকাশ করছ? হে গৃহবাসীরা, (বিশেষ করে) তোমাদের (এ গৃহের লোকদের) উপর তো আল্লাহ্ তা'আলার খাস রহমত এবং (বিভিন্ন প্রকার) বরকত নাযিল হয়ে আসছে। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা প্রশংসিত (এবং) মহিমাময়। (অতএব বিস্মিত না হয়ে বরং আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা ও শোকর আদায় কর।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য পাঁচটি আয়াতে হযরত ইবরাহীম খলিলুল্লাহ্ (আ)-র একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে সন্তান লাভের সুসংবাদ দেওয়ার জন্য তাঁর কাছে কতিপয় ফেরেশতাকে প্রেরণ করেছিলেন। কেননা, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর স্ত্রী বিবি সারা নিঃসন্তান ছিলেন। তিনি সন্তানের জন্য একান্ত উদগ্রীব ছিলেন; কিন্তু উভয়ের বার্ধক্যের চরম সীমায় উপনীত হওয়ার কারণে দৃশ্যত সন্তান লাভের কোন সম্ভাবনা ছিল না। এমতাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতার মাধ্যমে সুসংবাদ দান করলেন যে, তাঁরা অচিরেই একটি পুত্র সন্তান লাভ করবেন। তাঁর নামকরণ করা হল ইসহাক।

আরো অবহিত করা হল যে, হযরত ইসহাক (আ) দীর্ঘজীবী হবেন, সন্তান লাভ করবেন, তাঁর সন্তানের নাম হবে 'ইয়াকুব' (আ)। উভয়ে নবুয়তের মর্যাদায় অভিষিক্ত হবেন।

ফেরেশতাগণ মানবাকৃতিতে আগমন করায় হযরত ইবরাহীম (আ) তাদেরকে সাধারণ আগন্তুক মনে করে মেহমানদারীর আয়োজন করেন। ভুনা গোশত সামনে রাখলেন। কিন্তু তাঁরা ছিলেন ফেরেশতা, পানাহারের উর্ধ্বে। কাজেই সম্মুখে আহার্য দেখেও তাঁরা সেদিকে হাত বাড়ালেন না। এটা লক্ষ্য করে হযরত ইবরাহীম (আ) আতঙ্কিত হলেন যে, হয়ত এদের মনে কোন দুরভিসন্ধি রয়েছে। ফেরেশতাগণ হযরত ইবরাহীম (আ)-এর অমূলক আশঙ্কা আন্দাজ করে তা দূর করার জন্য স্পষ্টভাবে জানালেন যে, "আপনি শঙ্কিত হবেন না। আমরা আল্লাহ্‌র ফেরেশতা, আপনাকে একটি সুসংবাদ দান করা ও অন্য একটি বিশেষ কার্য সম্পাদনের জন্য প্রেরিত হয়েছি। তা হচ্ছে হযরত লূত (আ)-এর কওমের উপর আযাব নাযিল করা।" হযরত ইবরাহীম (আ)-এর স্ত্রী বিবি সারা পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা শুনেছিলেন। যখন বুঝতে পারলেন যে, এরা মানুষ নন, ফেরেশতা; তখন পর্দার প্রয়োজন রইল না। বৃদ্ধকালে সন্তান লাভের সুখবর শুনে হেসে ফেললেন এবং বললেন, এহেন বৃদ্ধ বয়সে আমার গর্ভে সন্তান জন্ম হবে! আর আমার এ স্বামীও তো অতি বৃদ্ধ। ফেরেশতাগণ উত্তর দিলেন, তুমি কি আল্লাহ্‌র ইচ্ছার প্রতি বিস্ময় প্রকাশ করছ? যাঁর অসাধ্য কিছুই নেই। বিশেষ করে তোমরা নবী পরিবারের লোক। তোমাদের পরিবারের উপর আল্লাহ্ তা'আলার প্রভূত রহমত এবং অফুরন্ত বরকত রয়েছে। বাহ্যিক কার্য-কারণের উর্ধ্বে বহু অলৌকিক ঘটনা তোমরা নিজ চোখে অবলোকন করছ। তা সত্ত্বেও বিস্মিত হওয়ার কোন কারণ আছে কি? এ হচ্ছে ঘটনার সংক্ষিপ্ত সার। এবার আয়াত সমূহের বিস্তারিত আলোচনায় আসা যাক।

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে যে, ফেরেশতাগণ হযরত ইবরাহীম (আ)-এর নিকট কোন সুসংবাদ নিয়ে এসেছিলেন। এই সুসংবাদের বিবরণ সামনে তৃতীয় আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَٰقَ

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন—ফেরেশতার দলে হযরত জিবরাঈল (আ), হযরত মীকাঈল (আ) ও ইস্রাফীল (আ)—এ তিনজন ফেরেশতা ছিলেন।—(কুরতুবী) তাঁরা মানবাকৃতিতে আগমন করে হযরত ইবরাহীম (আ)-কে সালাম করেন। হযরত ইবরাহীম (আ) যথারীতি সালামের জবাব দিলেন এবং তাঁদেরকে মানুষ মনে করে আতিথেয়তার আয়োজন করলেন। হযরত ইবরাহীম (আ)-ই প্রথম ব্যক্তি, যিনি পৃথিবীতে সর্বপ্রথম মেহমানদারীর প্রথা প্রবর্তন করেন। —(কুরতুবী) তাঁর নিয়ম ছিল যে, মেহমান ছাড়া একাকী কখনো খানা খেতেন না। খাবার সময় খোঁজ করে মেহমান নিয়ে এসে সাথে খেতে বসতেন।

তফসীরে কুরতুবীতে ইসরাইলী সূত্র উদ্ধৃত করে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ) একদিন তাঁর সাথে খানা খাওয়ার জন্য মেহমান তালাশ করছিলেন। এমন সময় জনৈক অচেনা লোকের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হল। তিনি তাকে ঘরে নিয়ে এলেন। যখন খানা খেতে শুরু করবেন, তখন হযরত ইবরাহীম (আ) আগন্তুক মুসাফিরকে বললেন—'বিসমিল্লাহ আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ করছি বল।' সে বলল—'আল্লাহ্ কাকে বলে আমি জানি না।' হযরত ইবরাহীম (আ) রাগান্বিত হয়ে তাকে দস্তরখান হতে তাড়িয়ে দিলেন। যখন সে বের হয়ে গেল, তৎক্ষণাৎ হযরত জিবরাঈল (আ) উপস্থিত হলেন এবং জানালেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন—আমি তার কুফরী সম্পর্কে জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও সারাজীবন তাকে আহার্য-পানীয় দিয়ে আসছি। আর আপনি একে এক বেলা খাবার দিতে পারলেন না। এ কথা শোনামাত্র হযরত ইবরাহীম (আ) ঐ লোকটির তালাশে ছুটলেন। অবশেষে তাকে ঘরে নিয়ে এলেন। কিন্তু সে ব্যক্তি বেঁকে বসল এবং বলল, "আপনি প্রথমে আমাকে তাড়িয়ে দিলেন, পরে আবার সাধাসাধি করে আনতে গেলেন কেন? এ কারণ না-জানা পর্যন্ত আমি খাদ্য স্পর্শ করব না।"

হযরত ইবরাহীম (আ) ঘটনা বর্ণনা করলেন। কাফির লোকটির মধ্যে ভাবান্তর সৃষ্টি হল। সে বলল—যে মহান পালনকর্তা ফেরেশতা প্রেরণ করে আপনাকে এ কথা জানিয়েছেন, তিনি সত্যিই পরম দয়ালু। আমি তাঁর প্রতি ঈমান আনলাম। অতপর সে বিসমিল্লাহ্ বলে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সাথে খানা খেতে আরম্ভ করল।

হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁর আতিথেয়তার অভ্যাস অনুযায়ী আগন্তুক ফেরেশতাগণকে মানুষ মনে করে অনতিবিলম্বে একটি বাছুর গরু যবেহ্ করলেন এবং তা ভুনা করে মেহমান ফেরেশতাগণের আহারের জন্য তাদের সামনে রাখলেন।

৭০তম আয়াতে বলা হয়েছে যে, আগন্তুক ফেরেশতাগণ যদিও মানবাকৃতিতে আগমন করেছিলেন এবং মানবসুলভ পানাহারের বৈশিষ্ট্য তাদেরকে দান করা যদিও সম্ভব ছিল। কিন্তু পানাহার না করার মধ্যেই হিকমত নিহিত ছিল, যেন তাঁদের ফেরেশতা হওয়া প্রকাশ পায়। কাজেই মানবাকৃতি সত্ত্বেও তাঁদের পানাহার না করায় 'ফেরেশতা স্বভাব' বজায় রাখা হয়েছিল। যার ফলে তাঁরা আহার্যের দিকে হাত বাড়ান নাই।

কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, ফেরেশতাদের হাতে কিছু তীর ছিল। তাঁরা এর ফলক দ্বারা ভুনা গোশত স্পর্শ করছিলেন। তাঁদের এহেন আচরণে হযরত ইবরাহীম (আ) সন্দিগ্ধ ও শঙ্কিত হলেন। কারণ, সে দেশে নিয়ম ছিল যে, অসদুদ্দেশ্যে কেউ কারো বাড়িতে মেহমান হলে সেখানে পানাহার করত না। ---(তফসীরে কুরতুবী) অবশেষে ফেরেশতাগণ প্রকাশ করে দিলেন যে, আপনি ভীত হবেন না। আমরা মানুষ নই, বরং আল্লাহ্‌র ফেরেশতা।

আহকাম ও মাসায়েল

আলোচ্য আয়াতসমূহে ইসলামী আচার-ব্যবহার সম্পর্কে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ হিদায়ত দেওয়া হয়েছে। ইমাম কুরতুবী (র) তদীয় তফসীরে যার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন।

সালামের সুন্নত ঃ قَالُوْا سَلٰمًا قَالَ سَلٰمٌ 'তাঁরা সালাম বললেন, তিনিও বললেন, সালাম।' এর দ্বারা বোঝা যায় যে, মুসলমানদের পারস্পরিক সাক্ষাৎ-মুলাকাতের সময় পরস্পরকে সালাম করা কর্তব্য। আরো জানা গেল যে, আগন্তুক ব্যক্তি প্রথমে সালাম করবে, অন্যরা তার জবাব দেবে—এটাই বাঞ্ছনীয়।

পারস্পরিক দেখা-সাক্ষাৎকালে বিশেষ কোন বাক্য উচ্চারণ করে একে অপরের প্রতি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করার রীতি পৃথিবীর সকল জাতি ও ধর্মের মধ্যে দেখা যায়। তবে এ ব্যাপারেও ইসলামের শিক্ষা অনন্য ও সর্বোত্তম। কেননা সালামের সুন্নত সম্মত বাক্য السلام عليكم-এর মধ্যে সর্বপ্রথম 'আস-সালামু' আল্লাহ্‌র একটি গুণ বাচক নাম হওয়ার কারণে আল্লাহ্‌র জিকির করা হল, সম্বোধিত ব্যক্তির জন্য সালামতি ও নিরাপত্তার দোয়া করা হল, নিজের পক্ষ হতে তার জানমাল ইজ্জতের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হল।

এখানে কোরআন পাকে ফেরেশতাদের পক্ষ হতে سلاما 'সালামান' এবং হযরত ইবরাহীম (আ)-এর তরফ হতে শুধু سلام 'সালামুন্' শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। সালাম ও জবাবের পূর্ণ বাক্য উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন মনে করা হয়েছে। কার্যত অবশ্য এখানে উভয়ক্ষেত্রে সুন্নত মুতাবিক সালাম ও জবাবের পূর্ণ বাক্যই বোঝানো হয়েছে। হযরত রসূলে করীম (সা)ও নিজের আচরণের মাধ্যমে সালামের পূর্ণ বাক্য শিক্ষাদান করেছেন। অর্থাৎ প্রথম পক্ষ আসসালামু আলাইকুম বলবে, তদুত্তরে দ্বিতীয় পক্ষ 'ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রহমতুল্লাহ্' বলবে।

মেহমানদারীর কতিপয় মূলনীতি ঃ فَمَا لَبِثَ اَنْ جَآءَ بِعِجْلٍ حَنِيْذٍ অর্থাৎ একটি ভুনা বাছুর উপস্থাপন করতে যতটুকু সময় একান্ত অপরিহার্য, তিনি তার চেয়ে বেশি বিলম্ব করলেন না।

এতদ্বারা কয়েকটি বিষয় জানা গেল। প্রথমত, মেহমান হাজির হওয়ার পর আহার্য-পানীয় যা কিছু তাৎক্ষণিকভাবে গৃহে মওজুদ থাকে তা মেহমানের সামনে পেশ করা এবং সামর্থ্যবান হলে উপাদেয় আহার্যের আয়োজন করা বাঞ্ছনীয় —(কুরতুবী)

দ্বিতীয়ত, মেহমান আপ্যায়নের জন্য বাড়াবাড়ি বা সাধ্যাতিরিক্ত আয়োজন করা সমীচীন নয়। সহজে যতটুকু ভাল খাদ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ করা যায়, তাই মেহমানের সামনে নিঃসঙ্কোচে পেশ করবে। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর কাছে অনেকগুলি গরু ছিল। তাই তিনি তৎক্ষণাৎ একটি বাছুর যবেহ্ করে ভুনে মেহমানগণের সামনে পেশ করেছিলেন।—(কুরতুবী)

তৃতীয়ত, বহিরাগত আগন্তুকদের আতিথেয়তা করা ইসলামের দৃষ্টিতে একটি নৈতিক ও মহত কার্য। এটা আম্বিয়ায়ে কিরাম ও মহান বুযুর্গগণের একটি ঐতিহ্যও বটে। আতিথেয়তা ওয়াজিব কি না, এ ব্যাপারে উলামায়ে কিরামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তবে অধিকাংশ উলামায়ে কিরামের মতে ওয়াজিব নয়, বরং সুন্নত। কোন কোন আলিমের মতে বহিরাগত আগন্তুকদের মেহমানদারী করা গ্রামবাসীদের জন্য ওয়াজিব। কেননা, গ্রামে তাদের জন্য সাধারণত কোন হোটেলের ব্যবস্থা নেই। পক্ষান্তরে শহরে হোটেল-রেস্টুরেন্টের সুব্যবস্থা থাকায় বিদেশী লোকদের মেহমানদারী করা শহরবাসীদের জন্য ওয়াজিব নয়।—(তফসীরে কুরতুবী)

فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ অতপর হযরত ইবরাহীম (আ) যখন দেখলেন যে, উক্ত আহার্যের দিকে তাদের হস্ত প্রসারিত হচ্ছে না, তখন তিনি সন্ত্রস্ত হলেন।

এর দ্বারা বোঝা গেল যে, মেহমানের সম্মুখে মেজবান কর্তৃক যা কিছু পেশ করা হয়, তা সাদরে গ্রহণ করা মেহমানের কর্তব্য। তা তার কাছে অরুচিকর হলেও গৃহ-কর্তার সন্তুষ্টির জন্য যৎসামান্য স্বাদ গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়।

এখানে আরো জানা গেল যে, অতিথির সম্মুখে খাদ্যসামগ্রী রেখে দূরে সরে যাওয়া রীতি নয়, বরং মেহমান আহার করেন কি না তা লক্ষ্য রাখা কর্তব্য। হযরত ইবরাহীম (আ) ফেরেশতাদের হাত গুটিয়ে রাখা লক্ষ্য করেছিলেন। তবে মেহমানের আহারের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকাও রীতিবিরুদ্ধ, বরং ভাসা-ভাসাভাবে লক্ষ্য করবে। কেননা লোকমার দিকে তাকিয়ে থাকা ভদ্রতার পরিপন্থী এবং মেহমানের জন্য বিব্রতকর। একদা খলীফা হিশাম ইবনে আবদুল মালিকের খানার মজলিসে জনৈক বেদুঈনও শরীক ছিল। তার লোকমার মধ্যে একটা পশম লক্ষ্য করে খলীফা সেদিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। কিন্তু তাতে বেদুঈন ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে দাঁড়াল এবং বলল, —আমরা এমন লোকের সাথে খানা খেতে পছন্দ করি না, যারা আমাদের লোকমার দিকে তাকিয়ে থাকে।

এখানে ইমাম তাবারী (র) বর্ণনা করেছেন যে, ফেরেশতাগণ প্রথমে আহার্য গ্রহণ করার অজুহাত হিসাবে বলেছিলেন যে, আমরা মুফত (বিনামূল্য) খানা খাই না। আপনি মূল্য ধার্য করুন, তাহলে খেতে পারি। হযরত ইবরাহীম (আ) বললেন—"ঠিক আছে, খানার মূল্য ধার্য করছি যে, শুরুতে 'বিসমিল্লাহ্' বলবেন এবং শেষে 'আলহাম-দুলিল্লাহ্' বলবেন। এ কথা শুনে হযরত জিবরাঈল (আ) তদীয় সঙ্গী ফেরেশতাদ্বয়কে বললেন—'আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে স্বীয় খলীল (অন্তরঙ্গ বন্ধু) রূপে গ্রহণ করেছেন। তিনি সত্যিই এর যোগ্য। এর দ্বারা জানা গেল যে, খানার প্রারম্ভে বিসমিল্লাহ্ ও সমাপ্তিতে আল-হামদুলিল্লাহ্ বলা সুন্নত।

فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ اِبْرٰهِيْمَ الرَّوْعُ وَجَآءَتْهُ الْبُشْرٰى يُجَادِلُنَا
فِيْ قَوْمِ لُوْطٍ ۝٧٤ اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ لَحَلِيْمٌ اَوَّاهٌ مُّنِيْبٌ ۝٧٥
يٰٓاِبْرٰهِيْمُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا ۚ اِنَّهٗ قَدْ جَآءَ اَمْرُ رَبِّكَ ۚ وَاِنَّهُمْ
اٰتِيْهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُوْدٍ ۝٧٦ وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوْطًا
سِيْٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَّقَالَ هٰذَا يَوْمٌ عَصِيْبٌ ۝٧٧
وَجَآءَهٗ قَوْمُهٗ يُهْرَعُوْنَ اِلَيْهِ ۭ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ
السَّيِّاٰتِ ۭ قَالَ يٰقَوْمِ هٰٓؤُلَاۗءِ بَنَاتِيْ هُنَّ اَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا
اللّٰهَ وَلَا تُخْزُوْنِ فِيْ ضَيْفِيْ ۭ اَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَّشِيْدٌ ۝٧٨
قَالُوْا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِيْ بَنٰتِكَ مِنْ حَقٍّ ۚ وَاِنَّكَ لَتَعْلَمُ
مَا نُرِيْدُ ۝٧٩ قَالَ لَوْ اَنَّ لِيْ بِكُمْ قُوَّةً اَوْ اٰوِيْٓ اِلٰى رُكْنٍ
شَدِيْدٍ ۝٨٠ قَالُوْا يٰلُوْطُ اِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَّصِلُوْٓا اِلَيْكَ
فَاَسْرِ بِاَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ اِلَّا
امْرَاَتَكَ ۭ اِنَّهٗ مُصِيْبُهَا مَآ اَصَابَهُمْ ۭ اِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ۭ اَلَيْسَ
الصُّبْحُ بِقَرِيْبٍ ۝٨١ فَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَاَمْطَرْنَا
عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ ۙ مَّنْضُوْدٍ ۝٨٢ مُّسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ ۭ
وَمَا هِيَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ بِبَعِيْدٍ ۝٨٣

(৭৪) অতপর যখন ইবরাহীম (আ)-এর আতঙ্ক দূর হল এবং তিনি সুসংবাদ প্রাপ্ত হলেন, তখন তিনি আমার সাথে তর্ক শুরু করলেন কওমে লূত সম্পর্কে। (৭৫) ইবরাহীম (আ) বড়ই ধৈর্যশীল, কোমল হৃদয়, আল্লাহমুখী সন্দেহ নেই। (৭৬) ইবরাহীম,

এহেন ধারণা পরিহার কর; তোমার পালনকর্তার হুকুম এসে গেছে, এবং তাদের উপর সে আযাব অবশ্যই আপতিত হবে, যা কখনো প্রতিহত হবার নয়। (৭৭) আর যখন আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ লূত (আ)-এর নিকট উপস্থিত হল, তখন তাদের আগমনে তিনি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলেন, এবং তিনি বলতে লাগলেন—আজ অত্যন্ত কঠিন দিন। (৭৮) আর তার কওমের লোকেরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার (গৃহ) পানে ছুটে আসতে লাগল। পূর্ব থেকেই তারা কুকর্মে তৎপর ছিল। লূত (আ) বললেন—'হে আমার কওম, এ আমার কন্যারা রয়েছে, এরা তোমাদের জন্য অধিক পবিত্রতমা। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর, এবং অতিথিদের ব্যাপারে আমাকে লজ্জিত করো না। তোমাদের মধ্যে কি কোন ভাল মানুষ নেই? (৭৯) তারা বলল—তুমি তো জানই, তোমার কন্যাদের নিয়ে আমাদের কোন গরজ নেই। আর আমরা কি চাই, তাও তুমি অবশ্যই জান। (৮০) লূত (আ) বললেন—হায়, তোমাদের বিরুদ্ধে যদি আমার শক্তি থাকত অথবা আমি কোন সুদৃঢ় আশ্রয় গ্রহণ করতে সক্ষম হতাম। (৮১) মেহমান ফেরেশতাগণ বলল —হে লূত (আ), আমরা তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ হতে প্রেরিত ফেরেশতা। এরা কখনো তোমার দিকে পৌঁছতে পারবে না। ব্যস, তুমি কিছুটা রাত থাকতে থাকতে নিজের লোকজন নিয়ে বাইরে চলে যাও! আর তোমাদের কেউ যেন পিছনে ফিরে না তাকায়। কিন্তু তোমার স্ত্রী, নিশ্চয় তার উপরও ওটা আপতিত হবে, যা ওদের উপর আপতিত হবে। ভোর বেলাই তাদের প্রতিশ্রুতির সময়, ভোর কি খুব কাছে নয়? (৮২) অবশেষে যখন আমার হুকুম এসে পৌঁছল, তখন আমি উক্ত জনপদকে উপরকে নিচে করে দিলাম এবং তার উপর স্তরে স্তরে কাকর পাথর বর্ষণ করলাম। (৮৩) যার প্রতিটি তোমার পালনকর্তার নিকট চিহ্নিত ছিল। আর তা পাপিষ্ঠদের থেকে খুব দূরেও নয়!

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

অতপর যখন (ফেরেশতাগণ নিজেদের আত্ম-পরিচয় দান করে অভয়বাণী শুনলেন এবং হযরত) ইবরাহীম (আ)-এর আতঙ্ক দূরীভূত হল এবং তিনি (সন্তান লাভের) সুখবর প্রাপ্ত হলেন, তখন (নিশ্চিত মনে হযরত) লূত (আ)-এর কওমের ধ্বংস সম্পর্কে বাক্যালিপি শুরু করলেন। বস্তুত তিনি সুপারিশ করতে চেয়েছিলেন যে, সেখানে তো স্বয়ং হযরত লূত (আ)-ও বর্তমান রয়েছেন। কাজেই, সেখানে যেন আযাব নাযিল না হয়। হযরত ইবরাহীম (আ) হয়ত আশা পোষণ করতেন যে, লূত (আ)-এর দেশবাসী ভবিষ্যতে ঈমান আনয়ন করবে। তাই হযরত লূত (আ)-এর দোহাই দিয়ে তাঁর কওমকে আযাব হতে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। নিশ্চয় হযরত ইবরাহীম (আ) অতিশয় সহনশীল, কোমল প্রাণ, (এবং সর্বাবস্থায়) আল্লাহ্‌মুখী (ছিলেন। অতএব, মাত্রাতিরিক্ত সুপারিশ করছিলেন। তাই ইরশাদ হল)—হে ইবরাহীম [(আ)! যদিও আপনি লূত (আ)-এর দোহাই দিচ্ছেন কিন্তু আপনার আসল উদ্দেশ্য তাঁর কওমের জন্য সুপারিশ করা। যা হোক, সত্বর তুমি] এহেন (ধ্যান) ধারণা পরিহার কর।

(কারণ, তারা কস্মিনকালেও ঈমান আনবে না। অতএব, তাদের সম্পর্কে) তোমার পালনকর্তার (চূড়ান্ত ফয়সালা ও) নির্দেশ এসে গেছে, এবং (যার ফলে) তাদের উপর এমন (অপ্রতিরোধ্য) আযাব অবশ্যই আপতিত হবে, যা কিছুতেই প্রতিহত হবার নয়। [সুতরাং এ ব্যাপারে কোন কথা বলা নিরর্থক। তবে লূত (আ)-এর সেখানে অবস্থানের জন্য চিন্তার কোন কারণ নেই। কেননা, তাঁদের এবং অপরাপর ঈমানদারকে প্রথমে অন্যত্র সরিয়ে নেয়ার ব্যবস্থা করা হবে। তারপরে আযাব নাযিল করা হবে। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বাদানুবাদের এখানেই পরিসমাপ্তি হল] এবং [হযরত ইবরাহীম (আ)-এর নিকট হতে বিদায় নিয়ে] যখন আমার প্রেরিত ফেরেশতারা (হযরত) লূত (আ) সমীপে উপস্থিত হল (তখন) তিনি তাদের (আগমনের) কারণে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলেন, [কারণ তাঁরা অতি আকর্ষণীয় চেহারার সুদর্শন তরুণ বেশে আগমন করেছিলেন। হযরত লূত (আ) তাদেরকে সত্যিকার মানুষ মনে করেছিলেন এবং তাঁর কওমের বিকৃত যৌন লিপ্সার বিভীষিকা তাঁর মানসপটে ভেসে উঠেছিল]। আর (এ জন্যই) তাঁর মন ছোট হয়ে গেল এবং (চরম অস্বস্তিবোধ করে) বলতে লাগলেন——আজকের দিনটি অত্যন্ত কঠিন দিন। (কারণ, একদিকে আগন্তুকদের কমনীয়-মোহনীয় চেহারা, অপরদিকে গোত্রের লোকদের চরম বিকৃতি। উপরন্তু তিনি ছিলেন আত্মীয়-স্বজনহীন নিঃসঙ্গ একাকী।) আর তাঁর কওমের লোকেরা (যখন এহেন মেহমান আগমনের খবর জানতে পারল, তখন উন্মাদনায় আত্মহারা হয়ে) স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর [অর্থাৎ হযরত লূত (আ)-এর] গৃহপানে ধাবিত হল। আর আগে থেকেই তারা কুকর্মে তৎপর ছিল। (এবারও তারা একই উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য ছুটে এসেছিল। হযরত) লূত (আ) অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হলেন এবং (অনুনয়-বিনয় করে) বললেন——হে আমার কওম! (তোমাদের ঘরে) আমার এসব কন্যারা (বধূরা) রয়েছে, এরা তোমাদের (যৌন ক্রিয়ার) জন্য সমধিক (যোগ্য ও) পবিত্রতমা। অতএব, (নওজোয়ান ছেলেদের প্রতি দৃষ্টিপাত ও হস্তক্ষেপ করার ব্যাপারে তোমরা) আল্লাহ্‌কে ভয় কর, এবং অতিথিগণের মাঝে আমাকে লজ্জিত করো না। (মেহমানদের উপর অন্যায় হস্তক্ষেপ করা আমাকে লজ্জিত ও বেইজ্জত করার নামান্তর। আগন্তুক মেহমানের প্রতি তোমাদের যদি কোন সহানুভূতি না থাকে, তবে অন্তত আমার খাতিরে তোমরা সংযম অবলম্বন কর। কারণ, আমি তোমাদের সমাজে স্থায়ীভাবে বসবাস করছি, সর্বদা তোমাদের কল্যাণের চেষ্টায় নিয়োজিত রয়েছি। কিন্তু তাঁর সকল কাকুতি-মিনতি ব্যর্থ হয়ে যেতে দেখে তিনি বললেন——আফসোস ও আশ্চর্যের বিষয়) তোমাদের মাঝে কি একজনও বিবেকবান ভাল মানুষ নেই! (যে আমার কথাটি নিজে বুঝবে এবং অন্যদের বোঝাবে।) তারা বলল——আপনি তো জানেনই (যে) আপনার ঐসব (বধূ ও) কন্যাদের মধ্যে আমাদের কোন গরজ নেই। (কেননা, নারীদের প্রতি আমাদের আসক্তি হয় না।) আর (এখানে) আমরা কি জিনিস (পেতে) চাই, তাও আপনি নিশ্চয় জানেন। (একান্ত নিরুপায় অসহায় অবস্থায় হযরত) লূত (আ) বলতে লাগলেন——হায়, (কত ভাল হত) যদি তোমাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলে তোমাদেরকে শায়েস্তা করার মত আমার শক্তি (সামর্থ্য) থাকত, অথবা আমি কোন সুদৃঢ় আশ্রয় গ্রহণ

করতে সক্ষম হতাম। (অর্থাৎ আমার জাতি আপনজনেরা যদি কাছে থাকত, তাহলে তোমরা এহেন আচরণ করতে পারতে না।) হযরত লূত (আ)-এর উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা লক্ষ্য করে তাঁকে আশ্বস্ত করার জন্য ফেরেশতাগণ (আত্মপরিচয় দান করে) বললেন---হে লূত (আ), (আমরা মানুষ নই, বরং) আমরা আপনার পালনকর্তার পক্ষ হতে প্রেরিত। (ফেরেশতা, অতএব, তারা আমাদের কিছুই করতে পারবে না। আমাদের তো দূরের কথা,) এরা আপনার নিকট পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না। (অধিকন্তু আমরা তাদের উপর আযাব নাযিল করার জন্যই আগমন করেছি।) অতএব, আপনি রাতের কোন অংশে আপন লোক-জন নিয়ে (এখান থেকে) বাইরে (অন্যত্র কোথাও) চলে যান। আর আপনাদের (সবাইকে হুঁশিয়ার করে দিবেন, যাওয়ার পথে) কেউ যেন পিছনে ফিরে না তাকায়, (বরং দ্রুতগতিতে সম্মুখে অগ্রসর হয়।) কিন্তু আপনার স্ত্রী (ঈমানদার না হওয়ার কারণে বিরত থাকবে) তার উপরও তা আপতিত হবে, যা ওদের উপর আপতিত হবে। (আর কিছুটা রাত থাকতে আপনাকে সরে যেতে বলছি। কারণ) তাদের (উপর আযাবের) জন্য প্রতিশ্রুত সময় ভোর বেলা নির্ধারিত হয়েছে। হযরত লূত (আ) তদীয় কওমের প্রতি অতিশয় রুষ্ট হয়েছিলেন। তাই বললেন---যা হওয়ার এখনি হয়ে যাক (দূরের মনসুর)। ফেরেশতাগণ বললেন---ভোর কি খুবই কাছে নয়? [যা হোক হযরত লূত (আ) রাত থাকতেই আপন লোকজন নিয়ে অন্যত্র চলে গেলেন। রাত ভোর হল, আযাবের ঘনঘটা শুরু হল। অবশেষে যখন আযাবের জন্য] আমার হুকুম এসে পৌঁছল, তখন আমি (ফেরেশতার মাধ্যমে) উক্ত বসতিকে (উল্টিয়ে উহার) উপরকে নিচে (ও নিচকে উপরে) করে দিলাম এবং তার উপর অবিশ্রান্ত পাথর বর্ষণ করলাম, যার প্রতিটি (পাথর) তোমার পালনকর্তার নিকট (অর্থাৎ আলমে গায়েবে) চিহ্নিত ছিল। (যার ফলে উক্ত পাথরগুলি অন্য সব পাথর হতে ভিন্ন ধরনের ছিল।) আর (মক্কা-বাসীদের অত্র কাহিনী হতে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। কেননা,) তা (অর্থাৎ কওমে লূতের বসতি) এ পাপিষ্ঠদের থেকে খুব দূরেও নয়। (বাণিজ্যিক সফরে সিরিয়ায় যাতায়াত পথে ওদের জনপদের ধ্বংসাবশেষ তারা দেখতে পাচ্ছে। অতএব, আল্লাহ্ ও রসূলের বিরুদ্ধাচরণ হতে তাদের ভয় করা উচিত।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা হূদে পূর্ববর্তী অধিকাংশ আম্বিয়ায়ে কিরাম (আ) ও তাঁদের উম্মতগণের কাহিনী ও নবীদের বিরুদ্ধাচরণ করার কারণে তাদের উপর বিভিন্ন প্রকার আসমানী আযাব অবতীর্ণ হওয়ার ঘটনাবলী বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে হযরত লূত (আ) ও তাঁর দেশবাসীর অবস্থা ও দেশবাসীর উপর কঠিন আযাবের বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

হযরত লূত (আ)-এর কওম একে তো কাফির ছিল, অধিকন্তু তারা এমন এক জঘন্য অপকর্ম ও লজ্জাকর অনাচারে লিপ্ত ছিল, যা পূর্ববর্তী কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মধ্যে পাওয়া যায় নি, বন্য পশুরাও যা ঘৃণা করে থাকে। অর্থাৎ পুরুষ কর্তৃক অন্য পুরুষের সাথে মৈথুন করা। ব্যভিচারের চেয়েও এটা জঘন্য অপরাধ। এ জন্যই তাদের

উপর এমন কঠিন আযাব অবতীর্ণ হয়েছে, যা অন্য কোন অপকর্মকারীদের উপর কখনো অবতীর্ণ হয় নি।

হযরত লূত (আ)-এর ঘটনা যা অত্র আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে, তা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত জিবরাঈল (আ)-সহ কতিপয় ফেরেশতাকে কওমে লূতের উপর আযাব নাযিল করার জন্য প্রেরণ করেন। যাত্রাপথে তাঁরা ফিলিস্তিনে প্রথমে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সমীপে উপস্থিত হন।

আল্লাহ্ তা'আলা যখন কোন জাতিকে আযাব দ্বারা ধ্বংস করেন, তখন তাদের কার্যকলাপের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আযাবই নাযিল করে থাকেন। এ ক্ষেত্রেও ফেরেশতাগণকে নওজোয়ানরূপে প্রেরণ করেন। হযরত লূত (আ)-ও তাঁদেরকে মানুষ মনে করে তাদের নিরাপত্তার জন্য উদ্বিগ্ন হলেন। কারণ মেহমানের আতিথেয়তা নবীর নৈতিক দায়িত্ব। পক্ষান্তরে দেশবাসীর কু-স্বভাব তাঁর অজানা ছিল না। উভয় সংকটে পড়ে তিনি স্বগতোক্তি করলেন—'আজকের দিনটি বড় সংকটময় দিন।'

আল্লাহ্ জাল্লা শানুহ এ দুনিয়াকে আজব শিক্ষাক্ষেত্র বানিয়েছেন, যার মধ্যে তাঁর অসীম কুদরত ও অফুরন্ত হেকমতের ভুরি ভুরি নিদর্শন রয়েছে। মূর্তিপূজারী আযরের গৃহে আপন অন্তরঙ্গ বন্ধু হযরত ইবরাহীম খলিলুল্লাহ্ (আ)-কে পয়দা করেছেন। হযরত লূত (আ)-এর মত একজন বিশিষ্ট পয়গাম্বরের স্ত্রী নবীর বিরুদ্ধাচরণ করে কাফিরদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করত। সম্মানিত ফেরেশতাগণ সুদর্শন নওজোয়ান আকৃতিতে যখন হযরত লূত (আ)-এর গৃহে উপনীত হলেন, তখন তাঁর স্ত্রী সমাজের দুষ্ট লোকদেরকে খবর দিল যে, আজ আমাদের গৃহে এরূপ মেহমান আগমন করেছেন। —(কুরতুবী ও মাযহারী)

হযরত লূত (আ)-এর আশংকা যথার্থ প্রমাণিত হল। যার বর্ণনা ৭৮ নং আয়াতে দেয়া হয়েছে وجاءه قومه يهرعون اليه "আর তাঁর কওমের লোকেরা আত্মহারা হয়ে তাঁর গৃহপানে ছুটে এল। আর আগে থেকেই তারা কুকর্মে অভ্যস্ত ছিল।" এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, জঘন্য কুকর্মের প্রভাবে তারা এতদূর চরম নির্লজ্জ হয়েছিল যে, হযরত লূত (আ)-এর মত একজন সম্মানিত পয়গাম্বরের গৃহ প্রকাশ্যভাবে অবরোধ করেছিল।

হযরত লূত (আ) যখন দেখলেন যে, তাদেরকে প্রতিরোধ করা দুষ্কর, তখন তাদেরকে দুষ্কৃতি হতে বিরত রাখার জন্য তাদের সর্দারদের নিকট স্বীয় কন্যাদের বিবাহ দেয়ার প্রস্তাব দিলেন। তৎকালে কাফির পাত্রের সাথে মুসলিম পাত্রীর বিবাহ বন্ধন বৈধ ছিল। হুযূরে আকরাম (সা)-এর প্রাথমিক যুগ পর্যন্ত এ হুকুম বহাল ছিল। এ জন্যই হযরত (সা) স্বীয় দুই কন্যাকে প্রথমে উতবা ইবনে আবূ লাহাব ও আবুল আস ইবনে রবী'র কাছে বিবাহ দিয়েছিলেন। অথচ তখন তারা উভয়ে কুফরী হালতে ছিল। পরবর্তীকালে ওহীর মাধ্যমে কাফিরের সাথে মুসলমান মেয়েদের বিবাহ হারাম ঘোষিত হয়। —(কুরতুবী)

কোন কোন তফসীরকারের মতে—এখানে হযরত লূত (আ) নিজের কন্যা দ্বারা সমগ্র জাতির বধূ-কন্যাদের বুঝিয়েছেন। কেননা, প্রত্যেক নবী নিজ উম্মতের জন্য পিতৃতুল্য এবং উম্মতগণ তাঁর রূহানী সন্তান স্বরূপ। যেমন কোরআনের ২১ পারা সূরা আহ্যাবের ৬ষ্ঠ আয়াত ঃ اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُهٗ اُمَّهٰتُهُمْ এর সাথে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ (রা)-এর কিরাতে وَهُوَ اَبٌ لَّهُمْ বাক্যেও বর্ণিত আছে, যার মধ্যে হযরত রসূলে করীম (সা)-কে সমগ্র 'উম্মতের পিতা' বলে অভিহিত করা হয়েছে। অন্য তফসীর অনুসারে হযরত লূত (আ)-এর কথার অর্থ হল, তোমরা নিজের কদাচার হতে বিরত হও এবং ভদ্রভাবে কওমের কন্যাদেরকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে বৈধভাবে স্ত্রীরূপে ব্যবহার কর।

অতপর হযরত লূত (আ) তাদেরকে আল্লাহ্র আযাবের ভীতি প্রদর্শন করে বললেন— فَاتَّقُوا اللّٰهَ 'আল্লাহ্কে ভয় কর' এবং কাকুতি-মিনতি করে বললেন— وَلَا تُخْزُوْنِ فِىْ ضَيْفِىْ "আমার মেহমানদের ব্যাপারে আমাকে অপমানিত করো না।" তিনি আরো বললেন,— اَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَّشِيْدٌ "তোমাদের মাঝে কি কোন ন্যায়নিষ্ঠ ভাল মানুষ নেই?" আমার আকুল আবেদনে যার অন্তরে এতটুকু করুণার সৃষ্টি হবে।

কিন্তু তাদের মধ্যে শালীনতা ও মনুষ্যত্বের লেশমাত্র ছিল না। তারা একযোগে বলে উঠল —"আপনি তো জানেনই যে, আপনার বধূ-কন্যাদের প্রতি আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। আর আমরা কি চাই, তাও আপনি অবশ্যই জানেন।"

লূত (আ) এক সংকটজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হলেন। তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে উঠলেন—হায়, আমি যদি তোমাদের চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী হতাম অথবা আমার আত্মীয়-স্বজন যদি এখানে থাকত, যারা এই জালিমদের হাত হতে আমাকে রক্ষা করতো, তাহলে কত ভালো হত!

ফেরেশতাগণ হযরত লূত (আ)-এর অস্থিরতা ও উৎকণ্ঠা লক্ষ্য করে প্রকৃত রহস্য ব্যক্ত করলেন এবং বললেন—আপনি নিশ্চিত থাকুন, আপনার দলই সুদৃঢ় ও শক্তিশালী। আমরা মানুষ নই, বরং আল্লাহ্র প্রেরিত ফেরেশতা। তারা আমাদেরকে কাবু করতে পারবে না, বরং আযাব নাযিল করে দুরাত্মা-দুরাচারদের নিপাত সাধনের জন্যই আমরা আগমন করেছি।

বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, "আল্লাহ্ তা'আলা হযরত লূত (আ)-এর উপর রহম করুন, তিনি নিরুপায় হয়ে সুদৃঢ় জামাতের আশ্রয় কামনা

করেছিলেন।" তিরমিযী শরীফে বর্ণিত আছে যে, হযরত লূত (আ)-এর পরবর্তী প্রত্যেক নবী সম্ভ্রান্ত ও শক্তিশালী বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।—(কুরতুবী)। স্বয়ং রসূলে করীম (সা)-এর বিরুদ্ধে কোরেশ-কাফিরগণ হাজার রকম অপচেষ্টা করেছিল। কিন্তু তাঁর হাশেমী গোত্রের লোকেরা সম্মিলিতভাবে তাঁকে আশ্রয় ও পৃষ্ঠপোষকতা দান করেছে, যদিও ধর্ম-মতের দিক দিয়ে তাদের অনেকেই ভিন্নমত পোষণ করত। এ জন্যই সম্পূর্ণ বনী হাশিম গোত্র রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাথে শামিল ছিল, যখন কোরাইশ কাফিররা তাদের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে তাদের দানা-পানি বন্ধ করে দিয়েছিল।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, দুর্বৃত্তরা যখন হযরত লূত (আ)-এর গৃহদ্বারে সমবেত হল, তখন তিনি গৃহদ্বার রুদ্ধ করেছিলেন। ফেরেশতাগণ গৃহে অবস্থান করছিলেন। আড়াল হতে দুষ্টদের কথাবার্তা চলছিল। তারা দেয়াল টপকে ভিতরে প্রবেশ এবং কপাট ভাঙতে উদ্যোগী হল। এমন সংগীন মুহূর্তে হযরত লূত (আ) পূর্বোক্ত বাক্যটি উচ্চারণ করেছিলেন। ফেরেশতাগণ তাঁকে অভয় দান করলেন এবং গৃহদ্বার খুলে দিতে বললেন। তিনি দুয়ার খুলে দিলেন। হযরত জিবরাঈল (আ) ওদের প্রতি তাঁর পাখার ঝাপটা দিলেন। ফলে তারা অন্ধ হয়ে গেল এবং ভাগতে লাগল।

তখন ফেরেশতাগণ আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশক্রমে হযরত লূত (আ)-কে বললেন ঃ আপনি কিছুটা রাত থাকতে আপনার লোকজনসহ এখান থেকে অন্যত্র সরে যান এবং সবাইকে সতর্ক করে দিন যে, তাদের কেউ যেন পিছনে ফিরে না তাকায়। তবে আপনার স্ত্রী ব্যতীত। কারণ, অন্যদের উপর যে আযাব আপতিত হবে, তাকেও সে আযাব ভোগ করতে হবে।

এর এক অর্থ হতে পারে যে, আপনার স্ত্রীকে সাথে নেবেন না। (দ্বিতীয় অর্থ হতে পারে, তাকে পিছনে ফিরে চাইতে নিষেধ করবেন না।—অনুবাদক।) আরেক অর্থ হতে পারে যে, সে আপনার হুঁশিয়ারি মেনে চলবে না।

কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, তাঁর স্ত্রীও সাথে যাচ্ছিল। কিন্তু পাপিষ্ঠদের উপর আযাব নাযিল হওয়ার ঘটনাটা শুনে পশ্চাতে ফিরে তাকাল এবং কওমের শোচনীয় পরিণতি দেখে দুঃখ প্রকাশ করতে লাগল। তৎক্ষণাৎ একটি প্রস্তরের আঘাতে সেও অক্কা পেল।—(কুরতুবী ও মাজহারী)

ফেরেশতারা আরো জানিয়ে দিলেন যে, إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ প্রত্যূষকালেই তাদের উপর আযাব আপতিত হবে। হযরত লূত (আ) বললেন—"আমি চাই, আরো জলদি আযাব আসুক।" ফেরেশতাগণ জবাব দিলেন ঃ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ "প্রত্যূষকাল দূরে নয়, বরং সমাগত প্রায়।"

অতপর উক্ত আযাবের ধরন সম্পর্কে কোরআন পাকে ইরশাদ হয়েছে—যখন আযাবের হুকুম কার্যকরী করার সময় হল, তখন আমি তাদের বসতির উপরিভাগকে নিচে করে দিলাম এবং তাদের উপর অবিশ্রান্তভাবে এমন পাথর বর্ষণ করলাম, যার প্রত্যেকটি পাথর একজনের নামে চিহ্নিত ছিল।

বর্ণিত আছে যে, চারটি বড় বড় শহরে তাদের বসতি ছিল। ঐসব জনপদকেই কোরআন পাকের অন্য আয়াতে مُؤْتَفِكَات 'মুতাফিকাত' নামে অভিহিত করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ পাওয়া মাত্র হযরত জিবরাঈল (আ) তাঁর পাখা উক্ত শহর চতুষ্টয়ের যমীনের তলদেশে প্রবিষ্ট করত এমনভাবে মহাশূন্যে উত্তোলন করলেন যে, সবকিছু নিজ নিজ স্থানে স্থির ছিল। এমন কি পানি ভর্তি পাত্র হতে এক বিন্দু পানিও পড়ল না বা নড়ল না। মহাশূন্য হতে কুকুর জানোয়ার ও মানুষের চিৎকার ভেসে আসছিল। ঐ সব জনপদকে সোজাভাবে আকাশের দিকে তুলে উলটিয়ে যথাস্থানে নিক্ষেপ করা হল। তারা আল্লাহ্র আইন ও প্রাকৃতিক বিধানকে উলটিয়েছিল, তাই এই ছিল তাদের উপযুক্ত শাস্তি।

হযরত লূত (আ)-এর নাফরমান জাতির শোচনীয় পরিণতি বর্ণনা করার পর দুনিয়ার অপরাপর জাতিকে সতর্ক করার জন্য ইরশাদ হয়েছে ঃ وَمَا هِيَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ بِبَعِيْدٍ প্রস্তর বর্ষণের আযাব বর্তমানকালের জালিমদের থেকেও দূরে নয়। বরং কোরাইশ কাফিরদের জন্য ঘটনাস্থল ও ঘটনাকাল খুবই কাছে এবং অন্যান্য পাপিষ্ঠও যেন নিজেদেরকে এহেন আযাব হতে দূরে মনে না করে। রসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেছেন "আমার উম্মতের কিছু লোক কওমে লূতের অপকর্মে লিপ্ত হবে। যখন এরূপ হতে দেখবে, তখন তাদের উপরও অনুরূপ আযাব আসার অপেক্ষা কর।'

وَإِلٰى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۚ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ
مَا لَكُمْ مِّنْ إِلٰهٍ غَيْرُهٗ ۚ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ
إِنِّيْٓ أَرٰىكُمْ بِخَيْرٍ وَّإِنِّيْٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيْطٍ ۝ وَيٰقَوْمِ
أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ
وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ۝ بَقِيَّتُ اللّٰهِ خَيْرٌ لَّكُمْ
إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۚ وَمَآ أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظٍ ۝ قَالُوْا يٰشُعَيْبُ

اَصَلٰوتُكَ تَاْمُرُكَ اَنْ نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَآ اَوْ اَنْ نَّفْعَلَ فِيْٓ
اَمْوَالِنَا مَا نَشٰٓؤُا ؕ اِنَّكَ لَاَنْتَ الْحَلِيْمُ الرَّشِيْدُ ﴿٨٧﴾ قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ
اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ وَرَزَقَنِيْ مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا ؕ
وَمَآ اُرِيْدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ اِلٰى مَآ اَنْهٰىكُمْ عَنْهُ ؕ اِنْ اُرِيْدُ اِلَّا
الْاِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ؕ وَمَا تَوْفِيْقِيْٓ اِلَّا بِاللّٰهِ ؕ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ
وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ ﴿٨٨﴾ وَيٰقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِيْٓ اَنْ يُّصِيْبَكُمْ مِّثْلُ
مَآ اَصَابَ قَوْمَ نُوْحٍ اَوْ قَوْمَ هُوْدٍ اَوْ قَوْمَ صٰلِحٍ ؕ وَمَا قَوْمُ لُوْطٍ
مِّنْكُمْ بِبَعِيْدٍ ﴿٨٩﴾ وَاسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ ؕ اِنَّ رَبِّيْ رَحِيْمٌ وَّدُوْدٌ ﴿٩٠﴾
قَالُوْا يٰشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَقُوْلُ وَاِنَّا لَنَرٰىكَ فِيْنَا
ضَعِيْفًا ۚ وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنٰكَ ۖ وَمَآ اَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيْزٍ ﴿٩١﴾
قَالَ يٰقَوْمِ اَرَهْطِيْٓ اَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَاتَّخَذْتُمُوْهُ وَرَآءَكُمْ
ظِهْرِيًّا ؕ اِنَّ رَبِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ ﴿٩٢﴾ وَيٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى
مَكَانَتِكُمْ اِنِّيْ عَامِلٌ ؕ سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ مَنْ يَّاْتِيْهِ عَذَابٌ
يُّخْزِيْهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ ؕ وَارْتَقِبُوْٓا اِنِّيْ مَعَكُمْ رَقِيْبٌ ﴿٩٣﴾
وَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا ۚ
وَاَخَذَتِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دِيَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ﴿٩٤﴾
كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا ؕ اَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُوْدُ ﴿٩٥﴾

(৮৪) আর মাদয়ানবাসীদের প্রতি তাদের ভাই শোয়াইব (আ)-কে প্রেরণ করেছি। তিনি বললেন—হে আমার কওম! আল্লাহ্‌র বন্দেগী কর, তিনি ছাড়া আমাদের কোন মাবুদ নেই। আর পরিমাপে ও ওজনে কম দিও না, আজ আমি তোমাদেরকে ভাল অবস্থায়ই দেখছি; কিন্তু আমি তোমাদের উপর এমন একদিনের আযাবের আশঙ্কা করছি যেদিনটি পরিবেষ্টনকারী। (৮৫) আর হে আমার জাতি, ন্যায়নিষ্ঠার সাথে ঠিকভাবে পরিমাপ কর ও ওজন দাও, এবং লোকদের জিনিসপত্রে কোনরূপ ক্ষতি করো না, আর পৃথিবীতে ফসাদ করে বেড়াবে না। (৮৬) আল্লাহ্‌ প্রদত্ত উদ্বৃত্ত তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা ঈমানদার হও, আর আমি তো তোমাদের উপর সদা পর্যবেক্ষণ-কারী নই। (৮৭) তারা বলল—হে শোয়াইব (আ), আপনার নামায কি আপনাকে এটাই শিক্ষা দেয় যে, আমরা ঐ উপাস্যদেরকে পরিত্যাগ করব আমাদের বাপ-দাদারা যাদের উপাসনা করত? অথবা আমাদের ধন-সম্পদে ইচ্ছামত যা কিছু করে থাকি, তা ছেড়ে দেব? আপনি তো একজন খাসা মহৎ ব্যক্তি ও সৎপথের পথিক। (৮৮) শোয়াইব (আ) বললেন—হে দেশবাসী, তোমরা কি মনে কর! আমি যদি আমার পরওয়ারদিগারের পক্ষ হতে সুস্পষ্ট দলীলের উপর কায়েম থাকি আর তিনি যদি নিজের তরফ হতে আমাকে উত্তম রিযিক দান করে থাকেন, (তবে কি আমি তাঁর হুকুম অমান্য করতে পারি?) আর আমি চাই না যে—তোমাদেরকে যা ছাড়াতে চাই পরে নিজেই সে কাজে লিপ্ত হব, আমি তো যথাসাধ্য শোধরাতে চাই। আল্লাহ্‌র মদদ দ্বারাই কিন্তু কাজ হয়ে থাকে, আমি তাঁর উপরই নির্ভর করি এবং তাঁরই প্রতি ফিরে যাই। (৮৯) আর হে আমার জাতি! আমার সাথে জিদ করে তোমরা নূহ বা হুদ অথবা সালেহ (আ)-র কওমের মত নিজেদের উপর আযাব ডেকে আনবে না। আর লূতের জাতি তো তোমাদের থেকে খুব দূরে নয়। (৯০) আর তোমাদের পালনকর্তার কাছে মার্জনা চাও এবং তারই পানে ফিরে এসো। নিশ্চয়ই আমার পরওয়ারদিগার খুবই মেহেরবান অতি স্নেহময়। (৯১) তারা বলল—হে শোয়াইব (আ), আপনি যা বলেছেন তার অনেক কথাই আমরা বুঝি নি, আমরা তো আপনাকে আমাদের মধ্যে দুর্বল ব্যক্তিরূপে মনে করি। আপনার ভাই-বন্ধুরা না থাকলে আমরা আপনাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করতাম। আমাদের দৃষ্টিতে আপনি কোন মর্যাদাবান ব্যক্তি নন! (৯২) শোয়াইব (আ) বললেন—হে আমার জাতি, আমার ভাই-বন্ধুরা কি তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌র চেয়ে প্রভাবশালী? আর তোমরা তাকে বিস্মৃত হয়ে পেছনে ফেলে রেখেছ, নিশ্চয় তোমাদের কার্যকলাপ আমার পালনকর্তার আয়ত্তে রয়েছে। (৯৩) আর হে আমার জাতি, তোমরা নিজ স্থানে কাজ করে যাও, আমিও কাজ করছি, অচিরেই জানতে পারবে কার উপর অপমানকর আযাব আসে আর কে মিথ্যাবাদী? আর তোমরাও অপেক্ষায় থাক, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষায় রইলাম। (৯৪) আর আমার হুকুম যখন এল, আমি শোয়াইব (আ) ও তার সঙ্গী ঈমানদারগণকে নিজ রহমতে রক্ষা করি, আর পাপিষ্ঠদের উপর বিকট গর্জন পতিত হলো। ফলে ভোর না হতেই তারা নিজেদের ঘরে উপুড় হয়ে পড়ে রইল। (৯৫) যেন তারা সেখানে কখনো বসবাসই করে নি। জেনে রাখ, সামূদের প্রতি অভিসম্পাতের মত মাদইয়ানবাসীর উপরেও অভিসম্পাত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর (আমি) মাদইয়ানবাসীদের প্রতি তাদের ভাই (হযরত) শোয়াইব (আ)-কে (পয়গম্বররূপে) প্রেরণ করলাম। তিনি (মাদইয়ানবাসীর সম্মুখে উপস্থিত হয়ে তাদেরকে) বললেন—হে আমার কওম, (তোমরা একমাত্র) আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত (বন্দেগী) কর, তিনি ছাড়া (আর) কেউ তোমাদের মা'বূদ (হওয়ার যোগ্য নেই। এ ছিল ধর্মীয় আকীদা সম্পর্কে তাদের উপযোগী হুকুম। অতপর লেনদেন সম্পর্কে তাদের উপযোগী দ্বিতীয় নির্দেশ দিলেন) আর পরিমাপে ও ওজনে কম দিও না, (কেননা, বর্তমানে) আমি তোমাদেরকে ভাল (ও সচ্ছল) অবস্থায় দেখছি, (সুতরাং মাপে কম দিয়ে লোক ঠকাবার প্রয়োজন নেই। বস্তুত মাপে কম দেওয়া কারো জন্যই বাঞ্ছনীয় নয়) কিন্তু (তবু যদি তোমরা মাপে কম দিতে থাক, তবে তা একদিকে আল্লাহ্র নিয়ামতের নাশোকরী করা হবে এবং এর প্রতিফলও তোমাদের ভোগ করতে হবে। তাই) আমি তোমাদের উপর একদিনের আযাবের আশঙ্কা করছি যে দিনটি (বিভিন্ন প্রকার আযাবকে) পরিবেষ্টনকারী হবে।

(মাপে কম দিতে নিষেধ করার প্রকারান্তরে ঠিক মত ওজন করার আদেশও রয়েছে, তবু তাকিদের জন্য পরে এটাকে আরো স্পষ্টভাবে বললেন।) আর হে আমার জাতি, ন্যায়নিষ্ঠার সাথে ঠিক ঠিকভাবে পরিমাপ কর ও ওজন দাও এবং লোকদের জিনিসপত্রে কোনরূপ ক্ষতি করো না। (যেমন পূর্ব হতে তোমাদের বদভ্যাস রয়েছে।) আর (শির্কী ও কুফরী এবং ওজনে হেরফের করে) পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে (তওহিদ ও ইনসাফের) সীমালংঘন করো না। (বরং মানুষের ন্যায্য পাওনা দিয়ে দেওয়ার পর) আল্লাহ্ প্রদত্ত (বৈধভাবে লব্ধ) উদ্বৃত্ত মাল তোমাদের জন্য (হারাম উপার্জনের তুলনায়) অধিকতর উত্তম। (কেননা, অবৈধ সম্পদ পরিমাণে অধিক হলেও তার মধ্যে বরকত নেই এবং তার পরিণতি জাহান্নাম। অপরদিকে বৈধ সম্পদ পরিমাণে কম হলেও তাতে বরকত হয়ে থাকে এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ হয়।) যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক, (তবে আমার কথা মান্য কর) অন্যথায় (তোমরাই দায়ী হবে) আমি তো তোমাদের উপর রক্ষণাবেক্ষণকারী নই যে, (বল প্রয়োগ করে তোমাদেরকে তা করাব অথবা ছাড়াব। বরং তোমরা যেমন কর্ম করবে তেমন ফল ভোগ করবে। এতসব আদেশ-উপদেশ শ্রবণ করার পর) তারা বলতে লাগল, হে শোয়াইব (আ), আপনার (মনগড়া) নামায (ও নৈতিকতা) কি আপনাকে এসব (কথা) শিক্ষা দেয় (যা আপনি আমাদেরকে বলছেন ? যে) আমরা আমাদের ঐসব উপাস্য দেব-দেবীগণের (পূজা) উপাসনা পরিত্যাগ করি, আমাদের বাপ-দাদারা যার উপাসনা করে আসছে। অথবা আমাদের ধন-সম্পদে ইচ্ছামত যা কিছু করার অধিকার রয়েছে তা ছেড়ে দেই। আপনি তো একজন (বেশ) বুদ্ধিমান ধর্মপরায়ণ (গজিয়েছেন)। এ উক্তিটি তারা (ব্যঙ্গ) বিদ্রূপ করে বলেছিল। (যেমন বর্তমানকালে ধর্মদ্রোহীরা দীনদার লোকদের সাথে বলে থাকে। তাদের মূল বক্তব্য ছিল যে আপনার নীতি-নৈতিকতার আমরা ধার ধারি না। আমরা যা করছি তা যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। মূর্তিপূজার প্রমাণ হচ্ছে যে, আমাদের

বাপ-দাদা পূর্ব পুরুষরা আদিকাল হতে তা করে আসছেন। ধন-সম্পদের ব্যাপারে যুক্তি হচ্ছে যে, তা আমাদের মালিকানা স্বত্ব। সুতরাং এর মধ্যে ইচ্ছামত যা কিছু হস্তক্ষেপ করার অধিকার ও ইখতিয়ার আমাদের রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তাদের যুক্তি-প্রমাণ সম্পূর্ণ অসার ও বাতিল ছিল।) হযরত শোয়াইব (আ) বললেন—হে আমার জাতি, (তওহীদ ও ন্যায়নীতির কথা বলতে তোমরা যে আমাকে বারণ করছ, কিন্তু) তোমরা কি মনে কর, আমি যদি আমার প্রভুর পক্ষ হতে (সুস্পষ্ট) দলীলের উপর (কায়েম) থাকি, (যার মধ্যে একত্ববাদ ও ন্যায়নীতির শিক্ষা রয়েছে,) আর তিনি যদি নিজের তরফ হতে আমাকে (একটি) উত্তম সম্পদ (অর্থাৎ নবুয়ত) দান করে থাকেন যার ফলে তওহীদ ও ইনসাফের প্রচার করা আমার একান্ত দায়িত্ব। আমি তোমাদের যেসব কথা বলছি নিজেও তা নিষ্ঠার সাথে পালন করছি। আর আমি চাই না যে, তোমাদেরকে যা নিষেধ করি, পরে তোমাদের বরখেলাপ নিজেই তা করব। (তোমাদেরকে এক রাস্তা বাত্‌লে দিয়ে নিজে অন্য পথে চলি না বরং নিজের জন্য যে রাস্তা পছন্দ করি, নিজে যে পথে চলি, তোমাদেরকেও সে পথে চালাতে চেষ্টা করি। অকৃত্রিম দরদী ও নিঃস্বার্থ হিতাকাঙ্ক্ষী হিসাবে) আমি তো (তোমাদেরকে) যথাসাধ্য সংশোধন করতে চাই। (আমল ও ইসলাহ করার যতটুকু তওফীক হয় তা একমাত্র) আল্লাহ্ তা'আলার মদদেই হয়ে থাকে। আমি তাঁরই উপর ভরসা রাখি এবং (সর্বকার্যে সর্বাবস্থায়) তাঁরই পানে প্রত্যাবর্তন করি। (এতক্ষণ তাদের বক্তব্যের জবাব দেওয়া হলো। অতপর ভীতি ও আশার বাণী শোনানো হচ্ছে।) আর হে আমার কওম! আমার সাথে জিদ (ও বিদ্বেষ) করে তোমরা নিজেদের উপর হযরত নূহ্, হুদ (অথবা) সালেহ্ (আ)-র কওমের মত আযাব ডেকে এনো না। আর (তাদের কাহিনী পুরাতন বা তোমাদের সময় থেকে বহু আগের বলে তোমাদের অন্তরে যদি এগুলো কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে না পারে, তবে) কওমে লূতের ঘটনা (কাল) তো তোমাদের থেকে খুব দূরে নয়। (বরং অন্যান্য ঘটনার তুলনায় নিকটবর্তী। অতএব, তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে সতর্ক হও। এতক্ষণ ভীতি প্রদর্শন করা হল, এবার আশার বাণী শোনানো হচ্ছে।) আর তোমরা নিজেদের পালনকর্তার কাছে (শির্‌কী, জুলুম ইত্যাদি যাবতীয় গুনাহের) মার্জনা চাও। (অর্থাৎ ঈমান আনয়ন কর এবং মানুষের পাওনা পরিশোধ কর।) অতপর (ইবাদত বন্দেগীর মাধ্যমে) তাঁরই পানে ফিরে এসো। নিঃসন্দেহে আমার পরওয়ারদিগার খুবই মেহেরবান। (অতি স্নেহময়, তিনি গোনাহ্ মার্জনা করেন এবং বন্দেগীর যথাযথ মূল্য দেন।) লোকেরা (তাঁর কথায় লা-জওয়াব হয়ে) বলল—হে শোয়াইব (আ), আপনি (এতক্ষণ যাবত) যা কিছু বলেছেন (বুঝিয়েছেন) তার অনেক কথাই আমাদের বোধগম্য হয়নি। এ কথার এক উদ্দেশ্য হতে পারে যে, আপনার কথায় আমরা কর্ণপাত করিনি। অন্য উদ্দেশ্য হতে পারে যে, আপনার বক্তব্যকে আমরা শ্রবণযোগ্য মনে করি না। (নাউজুবিল্লাহি মিন জালিক।) চরম অবজ্ঞার সাথে তারা আরো বলল—আমরা তো আপনাকে আমাদের (সমাজের) মধ্যে (সবচেয়ে হীন ও) দুর্বলতম (ব্যক্তি) মনে করি। আপনার ভাই-বন্ধুরা (যারা ধর্মীয় মতাদর্শে আমাদের সমমনা তাদের খাতির লেহায) না থাকলে আমরা (অনেক আগেই) আপনাকে

প্রস্তরাঘাতে হত্যা করে ফেলতাম। আমাদের দৃষ্টিতে আপনি কোন মর্যাদাবান ব্যক্তি নন। (কিন্তু আপনার ভাই-বন্ধুদের খাতিরে আপনাকে এতদিন কিছুই বলিনি। ভবিষ্যতে আর কখনো আমাদেরকে কোনরূপ আদেশ-উপদেশ দিতে চেষ্টা করবেন না। অন্যথায় আপনার বিপদ হবে। সারকথা, তারা প্রথমে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে তবলীগ করতে বাধা দেয় এবং পরিশেষে হুমকি দিয়ে সত্য ন্যায়ের কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা করে। তদুত্তরে হযরত। শোয়াইব (আ) বললেন—হে আমার কওম, আমার আত্মীয়-স্বজনরা কি তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌র চেয়েও প্রভাবশালী (নাউজুবিল্লাহ মিন জালিক)! অত্যন্ত আশ্চর্য ও পরিতাপের বিষয় যে, সর্বশক্তিমান (আল্লাহ্ তা'আলার সাথে আমার বিশেষ সম্পর্ক এবং আমি আল্লাহ্‌র নবী হওয়া সত্ত্বেও সেদিকে তোমরা ভ্রূক্ষেপ করনি, অথচ আত্মীয়-স্বজনের খাতিরে আমার উপর হস্তক্ষেপ করতে সাহস কর নাই)। আর তোমরা (আমার আত্মীয়-স্বজনের দিকটি বিবেচনা করেছ কিন্তু) তাঁকে (অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলাকে ভুলে) গিয়ে পিঠের পিছনে ফেলে রেখেছ। (অতএব অচিরেই এর প্রতিফল ভোগ করবে। কেননা,) তোমাদের (যাবতীয়) কার্যকলাপ আমার প্রভুর আয়ত্তে রয়েছে। আর হে আমার জাতি, (আযাবের সতর্কবাণী যদি তোমরা অবাস্তব মনে কর তবে ঠিক আছে) তোমরা নিজ নিজ স্থানে (ও অবস্থায়) কাজ চালিয়ে যাও, আমিও (নিজের) কাজে রত আছি। অচিরেই জানতে পারবে কার উপর অপমানকর আযাব আসে এবং মিথ্যাবাদী কে? (অর্থাৎ তোমরা আমার নবুয়তের দাবিকে মিথ্যা এবং আমাকে লাঞ্ছিত মনে কর। কিন্তু অবিলম্বে টের পাবে যে, মিথ্যুক ও লাঞ্ছিত কে? আমি না তোমরা।) আর তোমরাও অপেক্ষায় থাক, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষারত রইলাম। (দেখা যাক, আযাব অবতীর্ণ হয় কিনা এবং আমার সতর্কবাণী সত্য হয়, না তোমাদের আযাব না আসার ধারণা সঠিক হয়। অতপর কিছু দিনের মধ্যে আযাবের আয়োজন শুরু হল), আর আমার (আযাবের) হুকুম যখন এল (তখন) আমি (হযরত) শোয়াইব (আ)-কে ও তদীয় সঙ্গী ঈমানদারগণকে নিজের (খাস) রহমতে ও কুদরতে উক্ত আযাব হতে নিরাপদে রক্ষা করি। আর (উক্ত) পাপিষ্ঠদের (এক ভীষণ) গর্জন এসে পাকড়াও করল। [বস্তুত তা হযরত জিবরাঈল (আ)-এর একটি হাঁক ছিল]। ফলে ভোর বেলা তারা নিজ (নিজ) গৃহে উপুড় হয়ে মরে পড়ে রইল। (সারাদেশ ছিল নীরব নিস্তব্ধ যেন সেখানে তারা বা অন্য কোন ব্যক্তি কখনো বসবাসই করত না।) জেনে রাখ, মাদইয়ানবাসীরা আল্লাহ্‌র রহমত হতে দূরীভূত (হল), যেমন দূরীভূত হয়েছে সামূদ জাতি।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহে হযরত শোয়াইব (আ) ও তাঁর কওমের ঘটনাবলী বর্ণিত হয়েছে। তারা কুফরী ও শির্‌কী ছাড়া ওজনে-পরিমাপেও লোকদের ঠকাতো। হযরত শোয়াইব (আ) তাদেরকে ঈমানের দাওয়াত দিলেন এবং ওজনে কমবেশি করতে নিষেধ করলেন। আল্লাহ্‌র আযাবের ভয় দেখালেন। কিন্তু তারা অবাধ্যতা ও

নাফরমানীর উপর অটল রইল। ফলে এক কঠিন আযাবে সমগ্র জাতি ধ্বংস হয়ে গেল ;

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا- 'আর আমি মাদইয়ানের প্রতি তাদের ভাই শোয়াইব (আ)-কে প্রেরণ করছি।' 'মাদইয়ান' আসলে একটি শহরের নাম। মাদইয়ান ইব্নে ইবরাহীম এর পত্তন করেছিলেন। সিরিয়ার বর্তমান معان 'মোয়ান' নামক স্থানে তা অবস্থিত ছিল বলে ধারণা করা হয়। উক্ত শহরের অধিবাসিগণকে মাদইয়ানবাসী বলার পরিবর্তে শুধু 'মাদইয়ান' বলা হত। আল্লাহ্ তা'আলার বিশিষ্ট পয়গাম্বর হযরত শোয়াইব (আ) উক্ত মাদইয়ান কওমের লোক ছিলেন তাই তাঁকে 'তাদের ভাই' বলা হয়েছে। এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষ অনুগ্রহ করে তাদের স্বজাতির এক ব্যক্তিকে তাদের কাছে পয়গাম্বর হিসাবে প্রেরণ করলেন, যেন তাঁর সাথে জানাশোনা থাকার কারণে সহজেই তাঁর হিদায়ত গ্রহণ করে ধন্য হতে পারে।

قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ "তিনি বললেন—হে আমার জাতি, তোমরা একমাত্র আল্লাহ্র ইবাদত কর, তিনি ভিন্ন তোমাদের মাবূদ হওয়ার যোগ্য আর কেউ নেই। আর তোমরা ওজনে ও পরিমাপে কম দিও না।" এখানে হযরত শোয়াইব (আ) নিজ জাতিকে প্রথমে একত্ব-বাদের প্রতি আহবান জানালেন। কেননা, তারা ছিল মুশরিক, গাছ-পালার পূজা করত। এজন্যই মাদইয়ানবাসীকে 'আসহাবুল-আইকা' বা 'জঙ্গলওয়ালা' উপাধি দেওয়া হয়েছে। এহেন কুফরী ও শিরকীর সাথে সাথে আরেকটি মারাত্মক দোষ ও জঘন্য অপরাধ ছিল যে, আদান-প্রদান ও ক্রয়-বিক্রয় কালে ওজনে-পরিমাপে হেরফের করে লোকের হক আত্মসাৎ করত। হযরত শোয়াইব (আ) তাদেরকে এরূপ করতে নিষেধ করলেন।

এখানে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য যে, কুফরী ও শিরকীই সকল পাপের মূল। যে জাতি এতে লিপ্ত, তাদেরকে প্রথমই তওহীদের দাওয়াত দেওয়া হয়। ঈমান আনয়নের পূর্বে আমল ও কায়-কারবারের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয় না। দুনিয়াতে তাদের সফলতা অথবা ব্যর্থতাও শুধু ঈমান বা কুফরীর ভিত্তিতে হয়ে থাকে, এ ব্যাপারে আমলের কোন দখল থাকে না। কোরআন পাকে বর্ণিত পূর্ববর্তী নবীগণের ও তাঁদের জাতিসমূহের ঘটনাবলী এর প্রমাণ। তবে শুধু দুইটি জাতি এমন ছিল, যাদের উপর আযাব নাযিল হওয়ার ব্যাপারে কুফরীর সাথে সাথে তাদের বদআমলেরও দখল ছিল। এক, হযরত লূত (আ)-এর জাতি যাদের কাহিনী ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, তাদের কুফরী ও গর্হিত অপকর্মের কারণে তাদের বসতিকে উল্টিয়ে দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয়, হযরত শোয়াইব (আ)-এর কওম। যাদের উপর আযাব নাযিল হওয়ার জন্য কুফরী ও মাপে কম দেওয়াকে কারণ হিসাবে নির্দেশ করা হয়েছে।

এতে করে বোঝা যায় যে, পুংমৈথুন ও মাপে কম দেওয়া আল্লাহ্ তা'আলার কাছে সবচেয়ে জঘন্য ও মারাত্মক অপরাধ। কারণ, এটা এমন দুই কাজ যার ফলে সমগ্র মানব জাতির চরম সর্বনাশ সাধিত এবং সারা পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা-বিপর্যয় সৃষ্টি হয়।

ওজন-পরিমাপে হেরফের করার হীন মানসিকতা দূর করার জন্য হযরত শোয়াইব (আ) প্রথমে স্বীয় দেশবাসীকে পয়গাম্বরসুলভ স্নেহ ও দরদের সাথে বললেন ঃ إِنِّي أَرَاكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ- "বর্তমানে আমি তোমাদের অবস্থা খুব ভাল ও সচ্ছল দেখছি। তঞ্চকতার আশ্রয় গ্রহণ করার মত কোন কারণ দেখি না। তাই আল্লাহ্ তা'আলার এ অনুগ্রহে শোকর আদায় করার জন্য হলেও তোমাদের পক্ষে তাঁর কোন সৃষ্ট জীবকে ঠকানো উচিত নয়। তোমরা যদি আমার কথা না শোন, আমার নিষেধ অমান্য কর, তাহলে আমার ভয় হয় যে, আল্লাহ্র আযাব তোমাদেরকে ঘিরে ফেলবে। এখানে আখিরাতের আযাব বোঝানো হয়েছে, দুনিয়ার আযাবও হতে পারে, আবার দুনিয়ার আযাব বিভিন্ন প্রকারও হতে পারে। তন্মধ্যে সর্বনিম্ন আযাব হচ্ছে, তোমাদের সচ্ছলতা খতম হয়ে যাবে, তোমরা অভাব-গ্রস্ত দুর্ভিক্ষ কবলিত হবে। যেমন রসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেছেন "যখন কোন জাতি মাপে কম দিতে শুরু করে তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে দুর্ভিক্ষ ও মূল্যবৃদ্ধি-জনিত শাস্তিতে পতিত করেন।

ওজন-পরিমাপে কম দিতে নিষেধ করার মধ্যেই পরোক্ষভাবে যদিও সঠিক ওজন করার আদেশ হয়ে গেছে, তথাপি দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য হযরত শোয়াইব (আ) উদাত্ত আহ্বান জানালেন ঃ يَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ "হে আমার জাতি! ন্যায়-নিষ্ঠার সাথে ঠিক ঠিকভাবে পরিমাপ কর ও ওজন দাও এবং লোকদের জিনিস-পত্রে কম দিও না, আর পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না।" অতপর তিনি মমতার সাথে আরো বললেন ঃ بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ- মানুষের পাওনা ঠিকমত ওজন করে পুরোপুরি দিয়ে দেওয়ার পর যে লভ্যাংশ উদ্বৃত্ত থাকে, তোমাদের জন্য তা-ই উত্তম। পরিমাণে স্বল্প হলেও আল্লাহ্ তা'আলা তার মধ্যে বরকত দান করবেন, যদি তোমরা আমার কথা মান্য কর। আর যদি অমান্য কর, তবে মনে রেখো—তোমাদের উপর কোন আযাব অবতীর্ণ হলে, তা থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করার দায়িত্ব আমার নয়।

হযরত শোয়াইব (আ) সম্বন্ধে রসূলে করীম (সা) মন্তব্য করেছেন যে, তিনি হচ্ছেন 'খতীবুল-আম্বিয়া' বা নবীগণের মধ্যে প্রধান বক্তা। তিনি তাঁর সুললিত বয়ান ও অপূর্ব বাগ্মিতার মাধ্যমে স্বীয় জাতিকে বোঝানো এবং সৎপথে ফিরিয়ে আনার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। কিন্তু এত কিছু শোনার পরেও তাঁর কওমের লোকেরা পূর্ববর্তী বর্বর পাপিষ্ঠদের ন্যায় একই জবাব দিল তারা নবীর আহবানকে প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহ্‌র নবীকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে বলল ঃ أَصَلٰوتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَّفْعَلَ فِيْ أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيْمُ الرَّشِيْدُ - আপনার নামায কি আপনাকে শিখায় যে, আমরা আমাদের ঐসব উপাস্যের পূজা ছেড়ে দেই, আমাদের পূর্বপুরুষরা যার পূজা করে আসছে! আর আমাদের ধন-সম্পদকে নিজেদের ইচ্ছামত ব্যবহার করার অধিকারী না থাকি? কোন্‌টা হালাল, কোন্‌টা হারাম তা আপনার কাছে জিজ্ঞেস করে করে সব কাজ করতে হবে?

হযরত শোয়াইব (আ) সম্পর্কে সারাদেশে প্রসিদ্ধি ছিল যে, তিনি অধিকাংশ সময় নামায ও নফল ইবাদতে মগ্ন থাকেন। তাই তারা তাঁর মূল্যবান নীতিবাক্যসমূহকে বিদ্রূপ করে বলতো—আপনার নামায কি আপনাকে এসব আবোল-তাবোল কথাবার্তা শিক্ষা দিচ্ছে? (নাউজুবিল্লাহি মিন জালিক)

ওদের এসব মন্তব্য দ্বারা বোঝা যায় যে, এরা ধর্মকে শুধু কতিপয় আচার-আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ মনে করতো। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ধর্মকে কোন দখল দিত না। তারা মনে করত, প্রত্যেকে নিজ নিজ ধন-সম্পদ যেমন খুশি ভোগ দখল করতে পারে, এ ক্ষেত্রে কোন বিধি-নিষেধ আরোপ করা ধর্মের কাজ নয়। যেমন, বর্তমান যুগেও কোন কোন অবুঝ লোকের মধ্যে এহেন চিন্তাধারা পরিলক্ষিত হয়।

অকৃত্রিম দরদ, নিঃস্বার্থ কল্যাণকামিতা ও সদুপদেশের জবাবে কওমের লোকেরা কতবড় রূঢ় মন্তব্য করল! কিন্তু হযরত শোয়াইব (আ)-এর চরিত্রে ছিল নবীসুলভ সহনশীলতা। তাই উপহাস-পরিহাসের পরেও তিনি দরদের সাথে তাদেরকে সম্বোধন করে বোঝাতে লাগলেন ঃ يٰقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ وَرَزَقَنِيْ مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا -

হে আমার জাতি! তোমরা বল তো, যদি আমার প্রভুর পক্ষ হতে আমার কথার সত্যতার সাক্ষ্য আমার কাছে থাকে এবং আল্লাহ্ তা'আলা যদি আমাকে সর্বাধিক উত্তম রিযিক দান করে থাকেন, অর্থাৎ দেহের জন্য প্রয়োজনীয় বাহ্যিক রিযিকও দান করেছেন

অধিকন্তু বুদ্ধি-বিবেচনা তথা নবুয়তের দুর্লভ মর্যাদাও দান করেছেন, এতদসত্ত্বেও কি আমি তোমাদের মত অন্যায় ও গোমরাহীর পথ অবলম্বন করব এবং সত্যের বাণী তোমাদেরকে পৌঁছাব না ?

অতপর তিনি আরো বললেন ঃ مَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ -

তোমরা চিন্তা করে দেখ তো, আমি যে কাজ হতে তোমাদেরকে বাধা দেই, নিজেও তার কাছে কখনো যাই না। আমি যদি তোমাদেরকে নিষেধ করে নিজে সে কাজ করতাম তাহলে তোমাদের কথা বলার অবকাশ ছিল।

এতদ্বারা বোঝা গেল যে, ওয়াজ নসীহত ও তবলীগকারীর কথা ও কাজের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকা অপরিহার্য। অন্যথায় তাঁর কথায় শ্রোতাদের কোন ফায়দা হয় না।

অতপর বলেন ঃ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ

"আমার আপ্রাণ চেষ্টা এবং বারবার বোঝাবার একমাত্র উদ্দেশ্য তোমাদেরকে যথাসাধ্য সংশোধন করা। অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই। আর চেষ্টা-সাধনাও নিজ বাহু বলে নয় বরং ঃ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

"আমি যা কিছু করছি তা আল্লাহ্‌র মদদেই করছি। অন্যথায় আমার চেষ্টা করারও সাধ্য ছিল না। তাঁর উপরই আমি ভরসা রাখি এবং সর্বকাজে সর্বাবস্থায় তাঁরই প্রতি রুজু হই।"

নসীহত ও উপদেশ দানের পরে তিনি পুনরায় তাদেরকে আল্লাহ্‌র আযাব হতে সতর্ক করে বললেন ঃ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ -

হে আমার কওম, সাবধান! আমার সাথে বিদ্বেষ ও জিদ করে তোমরা নিজেদের উপর কওমে নূহ অথবা কওমে হুদ কিংবা সালেহ (আ)-এর কওমের মত বিপদ ডেকে আনবে না। আর লূত (আ)-এর জাতি ও তাদের শোচনীয় পরিণতি তো তোমাদের থেকে খুব দূরেও নয়। অর্থাৎ কওমে লূতের উল্টিয়ে দেয়া জনপদগুলি মাদইয়ান শহরের অদূরেই অবস্থিত। তাদের উপর আযাব নাযিল হওয়ার ঘটনা তোমাদের সময় থেকে খুব আগের কোন ব্যাপার নয়। অতএব, উহা হতে শিক্ষা গ্রহণ কর এবং হঠকারিতা পরিত্যাগ কর।

কওমের লোকেরা একথা শুনে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে বলতে লাগল—"আপনার গোষ্ঠি-জ্ঞাতির কারণে আমরা এতদিন আপনাকে কিছু বলিনি। নতুবা অনেক আগেই প্রস্তর আঘাতে আপনাকে হত্যা করে ফেলতাম।"

এরপরে হযরত শুয়াইব (আ) তাদেরকে নসীহত করে বললেন—"তোমরা আমার আত্মীয়-স্বজনকে ভয় কর, সম্মান কর, অথচ সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় কর না।"

শেষ পর্যন্ত কওমের লোকেরা যখন হযরত শুয়াইব (আ)-এর কোন কথা মানল না, তখন তিনি বললেন—"ঠিক আছে, তোমরা এখন আযাবের অপেক্ষা করতে থাক।" অতপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর চিরন্তন বিধান অনুসারে হযরত শুয়াইব (আ)-কে এবং তাঁর সঙ্গী-সাথী ঈমানদারগণকে উক্ত জনপদ হতে অন্যত্র নিরাপদে সরিয়ে নিলেন এবং হযরত জিবরাঈল (আ)-এর এক ভয়ঙ্কর হাঁকে অবশিষ্ট সবাই এক নিমেষে ধ্বংস হল।

আহ্কাম ও মাসায়েল

মাপে কম দেওয়া ঃ আলোচ্য আয়াতসমূহে মাদইয়ানবাসীদের ধ্বংস হওয়ার অন্যতম কারণ নির্দেশ করা হয়েছে মাপে কম দেওয়াকে, আরবীতে যাকে "তাতফীফ" বলা হয়। কোরআন করীমের—وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ আয়াতে তাদের জন্য কঠোর শাস্তির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। উলামায়ে উম্মতের 'ইজমা' বা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুসারে তা সম্পূর্ণ হারাম। ইমাম মালিক (র) তদীয় 'মুয়াত্তা' কিতাবে হযরত উমর ফারূক (রা)-এর একটি উক্তি উদ্ধৃত করে লিখেছেন যে, ওজনে-পরিমাপে কম দেওয়ার কথা বলে আসলে বোঝান হয়েছে—কারো কোন ন্যায্য পাওনা পুরোপুরি না দিয়ে কম দেওয়া; তা ওজন ও পরিমাপ করার বস্তু হোক অথবা অন্য কিছু হোক। কোন বেতনভোগী কর্মচারী যদি তার নির্দিষ্ট কর্তব্য পালনে গড়িমসি করে, কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী যদি নির্দিষ্ট সময়ের চেয়ে কম সময় কাজ করে, কোন শিক্ষক যদি যত্ন সহকারে শিক্ষাদান না করে অথবা কোন নামাযী ব্যক্তি যদি নামাযের সুন্নতগুলি পালনে অবহেলা করে তবে তারাও উক্ত তাতফীফের অপরাধীদের তালিকাভুক্ত হবে। (নাউযুবিল্লাহি মিনহু)

মাস'আলা ঃ তফসীরে কুরতুবীতে আছে যে, মাদইয়ানবাসীর আরেকটি দুষ্কর্ম ছিল যে, তারা প্রচলিত স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রার পার্শ্ব হতে স্বর্ণ-রৌপ্য কেটে রেখে সেগুলো বাজারে চালিয়ে দিত। হযরত শুয়াইব (আ) তাদেরকে এ কাজ হতেও নিষেধ করেছিলেন।

হাদীস শরীফে আছে যে, রসূলে করীম (সা) মুসলিম রাষ্ট্রের মুদ্রা ভগ্ন করাকে হারাম ঘোষণা করেছেন। কোরআন পাকের ১৯ পারা, সূরা নমল, ৪৮ নং আয়াত ঃ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ وَلَا يُصْلِحُوْنَ -এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইমামুল মুফাস্সিরীন হযরত জায়েদ ইবনে আসলাম বলেন—মাদইয়ানবাসীরা দিনার ও দিরহাম

কেটে তা থেকে স্বর্ণ-রৌপ্য আত্মসাৎ করতো, যাকে কোরআন করীমের ভাষায় মারাত্মক দুষ্কৃতি বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (র)-এর খিলাফতকালে এক ব্যক্তিকে দিরহাম কর্তনের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছিল। খলীফা তাকে দোর্রা মারা ও মস্তক মুণ্ডন করে শহর প্রদক্ষিণ করাবার নির্দেশ দিলেন।—(তফসীরে কুরতুবী)

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿٩٦﴾ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ
وَمَلَإِيْهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ ۖ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ﴿٩٧﴾
يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ ۖ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ ﴿٩٨﴾
وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ بِئْسَ الرِّفْدُ
الْمَرْفُودُ ﴿٩٩﴾ ذَٰلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ
وَحَصِيدٌ ﴿١٠٠﴾ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِن ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ
عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا جَاءَ
أَمْرُ رَبِّكَ ۖ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ ﴿١٠١﴾

(৯৬) আর আমি মূসা (আ)-কে প্রেরণ করি আমার নিদর্শনাদি ও সুস্পষ্ট সনদসহ ; (৯৭) ফিরাউন ও তার পারিষদবর্গের কাছে ; তবুও তারা ফিরাউনের হুকুমে চলতে থাকে, অথচ ফিরাউনের কোন কথা ন্যায়সঙ্গত ছিল না। (৯৮) কিয়ামতের দিন সে তার জাতির লোকদের আগে আগে থাকবে এবং তাদেরকে জাহান্নামের আগুনে পৌঁছে দেবে, আর সেটা অতীব নিকৃষ্ট স্থান, যেখানে তারা পৌঁছেছে। (৯৯) আর এ জগতেও তাদের পিছনে লানত রয়েছে এবং কিয়ামতের দিনেও ; অত্যন্ত জঘন্য প্রতিফল, যা তারা পেয়েছে। (১০০) এ হচ্ছে কয়েকটি জনপদের সামান্য ইতিবৃত্ত, যা আমি আপনাকে শোনাচ্ছি। তন্মধ্যে কোন কোনটি এখনও বর্তমান আছে আর কোন কোনটির শিকড় কেটে দেওয়া হয়েছে। (১০১) আমি কিন্তু তাদের প্রতি জুলুম করিনি বরং তারা নিজেরাই নিজের উপর অবিচার করেছে। ফলে আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে তারা যেসব মাবুদকে ডাকতো আপনার পালনকর্তার হুকুম যখন এসে পড়ল, তখন কেউ কোন কাজে আসল না। তারা শুধু বিপর্যয়ই বৃদ্ধি করল।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর আমি (হযরত) মূসা (আ)-কে প্রেরণ করেছি আমার (অলৌকিক) নিদর্শনাদি (অর্থাৎ মু'জিযাসমূহ) ও সুস্পষ্ট সনদসহ; (মিসর সম্রাট) ফিরাউন ও তদীয় পারিষদবর্গের কাছে; (কিন্তু) তবুও (ফিরাউন মানেনি এবং তার পারিষদবর্গও মানল না, বরং ফিরাউন আল্লাহ্‌দ্রোহিতার উপর স্থির রইল, আর) তারা (অর্থাৎ পারিষদবর্গও) ফিরাউনের কথামত কাজ করতে থাকে অথচ ফিরাউনের কোন কাজ ন্যায়সঙ্গত ছিল না। কিয়ামতের দিন সে (ফিরাউন) তার জাতির (সকল) লোকের আগে আগে থাকবে এবং তাদের (সবাইকে) নিয়ে জাহান্নামের (আগুনে) পৌঁছে দেবে আর তা (অর্থাৎ দোযখ) অতি নিকৃষ্ট অবতরণস্থল, যেখানে তাদেরকে পৌঁছানো হবে। আর ইহজগতেও তাদের পেছনে (পেছনে) লানত (রয়েছে) এবং কিয়ামতের দিনেও (তাদের সাথে সাথে লানত থাকবে। অতএব, দুনিয়াতে গযবে পতিত হয়ে ধ্বংস হয়েছে আর আখিরাতে জাহান্নামের আযাবে নিপতিত হবে।) অত্যন্ত জঘন্য প্রতিফল যা তাদের দেওয়া হয়েছে। (এতক্ষণ যেসব কাহিনী বর্ণিত হয়েছে) তা (ধ্বংসপ্রাপ্ত বসতিসমূহের মধ্যে) কয়েকটি জনপদের সামান্য ইতিবৃত্ত, যা আমি আপনার কাছে বর্ণনা করছি। তন্মধ্যে কোন কোন জনপদ তো এখনও বর্তমান রয়েছে (যেমন, মিসর। ফিরাউনের বংশ ধ্বংস হওয়ার পরও সেখানে জনবসতি রয়েছে)। আর কোন কোনটি সমূলে নিপাত করা হয়েছে। (যেমন—কওমে আদ, কওমে লূত প্রভৃতি। যা হোক,) আমি কিন্তু তাদের উপর জুলুম করিনি (অর্থাৎ বিনা অপরাধে শাস্তি দান করিনি, বস্তুত আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতা ও মালিকানা সত্ত্বেও বিনা অপরাধে কাউকে শাস্তি দান করেন না।) বরং তারা নিজেরাই নিজেদের উপর অবিচার করেছে। (কারণ, শাস্তিযোগ্য, অপরাধমূলক কার্যকলাপ অব্যাহতভাবে করে করে তারা নিজেদের উপর আযাব ও গযব ডেকে এনেছে।) ফলে আল্লাহ্ তা'আলাকে বাদ দিয়ে তারা (নিজেদের মনগড়া) যেসব বাতিল উপাস্যকে ডাকতো, যখন তোমার প্রভুর (আযাবের) হুকুম এসে পড়ল, তখন কেউ তাদের (উপর আপতিত সে আযাব প্রতিহত অথবা অন্য) কোন (রূপ) সাহায্য করতে পারল না। (সাহায্য তো দূরের কথা) বরং ক্ষতিগ্রস্ত করল (কেননা তাদের পূজা-উপাসনা করার অপরাধেই তারা বিপর্যস্ত ও ধ্বংস হয়েছে)।

وَكَذٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَآ اَخَذَ الْقُرٰى وَهِىَ ظَالِمَةٌ ۭ اِنَّ اَخْذَهٗٓ
اَلِيْمٌ شَدِيْدٌ ۝ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ الْاٰخِرَةِ ۭ
ذٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوْعٌ ۙ لَّهُ النَّاسُ وَذٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُوْدٌ ۝ وَمَا نُؤَخِّرُهٗٓ
اِلَّا لِاَجَلٍ مَّعْدُوْدٍ ۝ يَوْمَ يَاْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ۚ

فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَّسَعِيْدٌ ۝١٠٥ فَاَمَّا الَّذِيْنَ شَقُوْا فَفِى النَّارِ لَهُمْ فِيْهَا
زَفِيْرٌ وَّشَهِيْقٌ ۝١٠٦ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ
اِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ؕ اِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ ۝١٠٧ وَاَمَّا الَّذِيْنَ
سُعِدُوْا فَفِى الْجَنَّةِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ
وَالْاَرْضُ اِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ؕ عَطَآءً غَيْرَ مَجْذُوْذٍ ۝١٠٨ فَلَا تَكُ فِىْ مِرْيَةٍ
مِّمَّا يَعْبُدُ هٰٓؤُلَآءِ ؕ مَا يَعْبُدُوْنَ اِلَّا كَمَا يَعْبُدُ اٰبَآؤُهُمْ مِّنْ قَبْلُ ؕ
وَاِنَّا لَمُوَفُّوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوْصٍ ۝١٠٩ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى
الْكِتٰبَ فَاخْتُلِفَ فِيْهِ ؕ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِىَ
بَيْنَهُمْ ؕ وَاِنَّهُمْ لَفِىْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ ۝١١٠ وَاِنَّ كُلًّا لَّمَّا
لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ اَعْمَالَهُمْ ؕ اِنَّهٗ بِمَا يَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝١١١

(১০২) আর তোমার পরওয়ারদিগার যখন কোন পাপপূর্ণ জনপদকে ধরেন, তখন এমনিভাবেই ধরে থাকেন। নিশ্চয় তাঁর পাকড়াও খুবই মারাত্মক, বড়ই কঠোর (১০৩) নিশ্চয় এর মধ্যে নিদর্শন রয়েছে এমন প্রতিটি মানুষের জন্য, যে আখিরাতের আযাবকে ভয় করে। তা এমন একদিন, যে দিন সব মানুষেই সমবেত হবে, সেদিনটি যে হাযিরের দিন। (১০৪) আর আমি যে তা বিলম্বিত করি, তা শুধু একটি ওয়াদার কারণে যা নির্ধারিত রয়েছে। (১০৫) যেদিন তা আসবে সেদিন আল্লাহ্‌র অনুমতি ছাড়া কেউ কোন কথা বলতে পারবে না। অতপর কিছু লোক হবে হতভাগ্য, আর কিছু লোক সৌভাগ্যবান! (১০৬) অতএব যারা হতভাগ্য তারা দোযখে যাবে, সেখানে তারা আর্তনাদ ও চিৎকার করতে থাকবে। (১০৭) তারা সেখানে চিরকাল থাকবে; যতদিন আসমান ও যমীন বর্তমান থাকবে। তবে তোমার প্রতিপালক অন্য কিছু ইচ্ছা করলে ভিন্ন কথা। নিশ্চয় তোমার পরওয়ারদিগার যা ইচ্ছা করতে পারেন। (১০৮) আর যারা সৌভাগ্যবান তারা বেহেশতের মাঝে, সেখানেই চিরদিন থাকবে, যতদিন আসমান ও যমীন বর্তমান থাকবে। তবে তোমার প্রভু অন্য কিছু ইচ্ছা করলে ভিন্ন কথা। এ দানের ধারাবাহিকতা কখনো ছিন্ন হওয়ার নয়। (১০৯) অতএব, তারা যেসবের উপাসনা করে তুমি সে ব্যাপারে কোনরূপ ধোঁকায় পড়বে না। তাদের পূর্ববর্তী বাপ-দাদারা যেমন পূজা-উপাসনা করত, এরাও তেমন করছে। আর নিশ্চয় আমি তাদেরকে

আযাবের ভাগ কিছু মাত্র কম না করেই পুরোপুরি দান করবো। (১১০) আর আমি মূসা (আ)-কে অবশ্যই কিতাব দিয়েছিলাম অতপর তাতে বিরোধ সৃষ্টি হল; বলা বাহুল্য তোমার পালনকর্তার পক্ষ হতে, একটি কথা যদি আগেই বলা না হত, তাহলে তাদের মধ্যে চূড়ান্ত ফয়সালা হয়ে যেত। তারা এ ব্যাপারে এমনই সন্দেহপ্রবণ যে কিছুতেই নিশ্চিত হতে পারছে না। (১১১) আর যত লোকই হোক না কেন, যখন সময় হবে, তোমার প্রভু তাদের সকলেরই আমলের প্রতিদান পুরোপুরি দান করবেন। নিশ্চয় তিনি তাদের যাবতীয় কার্যকলাপের খবর রাখেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর [হে মুহাম্মদ (সা)] আপনার পরওয়ারদিগারের পাকড়াও এমনই (কঠিন) হয়ে থাকে, যখন তিনি কোন জনপদ (বাসী)-কে পাকড়াও করেন, এমতাবস্থায় যে তারা জুলুম (ও কুফরীতে) লিপ্ত। নিশ্চয় তাঁর পাকড়াও খুবই নির্মম এবং বড়ই কঠিন (এবং কেউ তা এড়িয়ে যেতে পারে না।) নিশ্চয় এসব ঘটনার মধ্যে (শিক্ষাপ্রদ) নিদর্শন রয়েছে (এমন) প্রতিটি মানুষের জন্য যে আখিরাতের আযাবকে ভয় করে (কেননা, ইহজগত কর্মফল ভোগের স্থান না হওয়া সত্ত্বেও যখন তাদের এরূপ নির্মম শাস্তি হয়েছে, তাহলে কর্মফল ভোগের স্থান অর্থাৎ পরকালে তাদের শাস্তি কত মর্মান্তিক হবে)। তা (অর্থাৎ কিয়ামত দিবস) এমন এক দিন, যেদিন সব মানুষকে একত্র করা হবে, সেদিনটি যে সকলের উপস্থিতির দিন। (সেদিনটি যদিও অদ্যাবধি আসেনি কিন্তু অচিরেই আসবে, তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। আর আমি এটাকে (শুধু কিছু কালের জন্য) বিলম্বিত করছি, (যাতে অনেক রহস্য নিহিত রয়েছে। অতপর) যেদিন তা আসবে, সেদিন (সবাই এতদূর ভীত-বিহবল হয়ে পড়বে যে,) আল্লাহ্‌র অনুমতি ছাড়া কেউ কোন কথা বলতে পারবে না। (তবে পরে যখন জবাবদিহির জন্য তলব করা হবে এবং তাদের কার্যকলাপের কৈফিয়ত চাওয়া হবে, তখন অবশ্যই কথা বলতে পারবে; চাই তাদের ওজর গ্রহণযোগ্য হোক অথবা না হোক এ পর্যন্ত সকলের এক অবস্থা হবে।) অতপর (তাদের মধ্যে পার্থক্য করা হবে) কিছু লোক (অর্থাৎ কাফির ও মুশরিকরা) হবে হতভাগ্য আর কিছু লোক (অর্থাৎ মু'মিন মুসলমানগণ) হবে সৌভাগ্যবান। অতএব, হতভাগ্যরা জাহান্নামে যাবে, তারা সেখানে আর্তনাদ ও চিৎকার করতে থাকবে। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে, যতদিন আসমান ও যমীন বর্তমান থাকে। (এখানে আসমান-যমীন দ্বারা বর্তমান আসমান-যমীন বোঝান হয় নাই বরং আখিরাতের আসমান ও যমীন, যা চিরকাল থাকবে তা-ই বোঝান হয়েছে, অথবা কথ্য বাচন ভঙ্গি অনুসারে এ কথার অর্থই হচ্ছে, তারা তথায় চিরকাল অবস্থান করবে। সেখান থেকে বেরিয়ে আসার কোন উপায় থাকবে না।) তবে তোমার পালনকর্তা (কাউকে বের করতে) চাইলে ভিন্ন কথা। (কেননা) তোমার প্রভু যা কিছু ইচ্ছা করেন, তা-ই (বাস্তবায়িত) করতে পারেন। (কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার সর্বময় ক্ষমতা ও অধিকার থাকা সত্ত্বেও এটা সুনিশ্চিত যে, তিনি কখনো তাদেরেক

দোযখ হতে পরিত্রাণ দিতে চাইবেন না। অতএব, তারা মুক্তি লাভ করতে পারবে না।) আর যারা সৌভাগ্যবান, তারা বেহেশতের মাঝে অবস্থান করবে। তারা (তথায় প্রবেশ করার পর) সেখানেই চিরকাল থাকবে—যতদিন আসমান ও যমীন (বর্তমান) থাকবে, (যদিও বেহেশতে প্রবেশ করার পূর্বে তারা কিছু শাস্তি ভোগ করেও থাকে।) তবে তোমার প্রভু অন্য কিছু ইচ্ছা করলে ভিন্ন কথা। এ দানের ধারাবাহিকতা কখনো ছিন্ন হওয়ার নয়। অতএব, হে শ্রোতা (কুফরীর পরিণতি জানার পর) তারা যেসবের পূজা-উপাসনা করে, তুমি সে ব্যাপারে কোনরূপ সন্দেহে পতিত হয়ো না (বরং দৃঢ় বিশ্বাস রাখ যে, বাতিল উপাস্যদের পূজা-উপাসনা করার কারণে তারা শাস্তিযোগ্য অপরাধী। তাদের উপাস্য বাতিল হওয়ার প্রমাণ এই যে, কোনরূপ যুক্তি-প্রমাণ ছাড়া বরং যুক্তি-প্রমাণের পরিপন্থী) তাদের পূর্ববর্তী বাপ-দাদারা যেমন (গায়রুল্লাহ্‌র অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের) পূজা-উপাসনা করত এরাও (তাদের দেখাদেখি তেমনি পূজা উপাসনা) করছে। (এবং দলীল প্রমাণের পরিপন্থী যে-কোন কার্য বাতিল ও দণ্ডযোগ্য অপরাধ। আর অবশ্যই আমি (কিয়ামতের দিন) তাদেরকে আযাবের ভাগ কিছুমাত্র হ্রাস না করেই পুরোপুরি দান করব। আর আমি (হযরত) মূসা (আ)-কে অবশ্যই (তওরাত) কিতাব দিয়েছিলাম। অতপর তাতেও কোরআন পাকের ন্যায় মতবিরোধ সৃষ্টি হল, (কেউ তা মানল আর কেউ মানল না। এটা কোন নতুন ঘটনা নয়, অতএব, আপনি চিন্তিত হবেন না। বলা বাহুল্য, এরা এমন শাস্তিযোগ্য অপরাধী যে,) তোমার পরওয়ারদিগারের পক্ষ হতে (তাদেরকে পূর্ণ শাস্তি আখিরাতে দেওয়া হবে বলে) একটি কথা যদি আগেই বলা না থাকত, তাহলে (যে ব্যাপারে) তাদের মধ্যে (মতানৈক্য রয়েছে তার) চূড়ান্ত ফয়সালা (দুনিয়াতেই) হয়ে যেত। (অর্থাৎ নির্ধারিত আযাব তাদের উপর আপতিত হত। আর অকাট্য দলিল-প্রমাণের মাধ্যমে প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও) তারা (এখনো পর্যন্ত) এ (ফয়সালা ও আযাব) সম্পর্কে এমনই সন্দেহপ্রবণ যে, (তারা) কিছুতেই নিশ্চিত হতে পারছে না। (অর্থাৎ তাদের বিশ্বাসই হচ্ছে না।) আর (কারো অস্বীকার বা সন্দেহের কারণে আযাব ফিরে যাবে না, বরং;) যথাসময়ে আপনার পরওয়ারদিগার তাদের সবাইকে তাদের কার্যকলাপের প্রতিদান পুরোপুরি দান করবেন। নিশ্চয় তিনি তাদের (প্রতিটি) কার্যকলাপের (পূর্ণ) খবর রাখেন। (তাদের শাস্তির সাথে যেহেতু আপনার কোন সম্পর্ক নেই, সুতরাং আপনার ও মুসলমানদের নিজেদের কাজ চালিয়ে যাওয়া বাঞ্ছনীয় সেই কাজ হলো পরবর্তী আয়াতে যার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।)

فَاسْتَقِمْ كَمَآ أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا ۚ إِنَّهُۥ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٢﴾ وَلَا تَرْكَنُوٓا إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ ۙ
وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَآءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿١١٣﴾

(১১২) অতএব, তুমি এবং তোমার সাথে যারা তওবা করেছে সবাই সোজা পথে চলে যাও—যেমন তোমায় হুকুম দেওয়া হয়েছে এবং সীমা লঙ্ঘন করবে না, তোমরা যা কিছু করছ, নিশ্চয় তিনি তার প্রতি দৃষ্টি রাখেন। (১১৩) আর পাপিষ্ঠদের প্রতি ঝুঁকবে না। নতুবা তোমাদেরকেও আগুনে ধরবে। আর আল্লাহ্ ছাড়া তোমাদের কোন বন্ধু নেই। অতএব কোথাও সাহায্য পাবে না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

অতএব, আপনাকে যেরূপ হুকুম দেওয়া হয়েছে (তেমনিভাবে দীনের পথে) সোজা চলতে থাকুন আর যারা কুফরী (ও শিরকী) থেকে তওবা করেছে (এবং) আপনার সাথে রয়েছে তারাও (সবাই সোজা পথে চলতে থাকুক) এবং (ধর্মীয় বিধি-নিষেধের) সীমা (-রেখা চুল পরিমাণও) অতিক্রম করবে না। (কেননা,) তোমরা যা (কিছু) করছ, নিশ্চয় তিনি (অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা) তার প্রতি খুব দৃষ্টি রাখেন। আর (হে মুসলমানগণ,) তোমরা (কখনো ঐসব) পাপিষ্ঠদের প্রতি (অথবা তাদের সমতুল্য লোকদের প্রতি) আকৃষ্ট হয়ো না (অর্থাৎ তাদের সাথে অন্তরঙ্গতা, সৌহার্দ্য বা আচার-আচরণে বা কৃষ্টি-সংস্কৃতিতে তাদের সাথে সামঞ্জস্য রাখবে না।) নতুবা (তাদের সাথে সাথে) তোমাদেরকেও (জাহান্নামের) আগুন পাকড়াও করবে। আর (তখন একমাত্র) আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া তোমাদের কোন বন্ধু নেই; অতএব, কোথাও (কোন) সাহায্য পাবে না। (কেননা সাহায্য করার চেয়ে বন্ধুত্ব করা সহজতর। বন্ধুত্বই যখন থাকবে না, তখন সাহায্যকারী কোথায় পাবে?

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা হূদে হযরত নূহ (আ) হতে হযরত মূসা (আ) পর্যন্ত বিশিষ্ট নবীগণ ও তাঁদের জাতিসমূহের ঘটনাবলী এক বিশেষ বর্ণনাশৈলীর মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়েছে, যার মাধ্যমে বহু উপদেশ, হিকমত, আহকাম ও হিদায়তও বর্ণিত হয়েছে। অতপর উক্ত ঘটনাবলী হতে শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য রসূলে করীম (সা)-কে সম্বোধন করে সমগ্র উম্মতে-মুহাম্মদীকে আহবান জানান হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে ঃ

ذٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرٰى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ

অর্থাৎ এটা পূর্ববর্তী যুগের কতিপয় শহর ও জনপদের কাহিনী আমি আপনার সামনে তুলে ধরছি, যার উপর আল্লাহ্র আযাব আপতিত হয়েছে। তন্মধ্যে কোন কোন শহরের ধ্বংসাবশেষ এখনও বর্তমান আছে। আর কোন কোন জনপদকে এমনভাবে নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে, যেমন ক্ষেতের ফসল কর্তন করে তাকে সমান করার পর পূর্ববর্তী ফসলের কোন চিহ্ন থাকে না।

অতপর বলেন যে, আমি তাদের উপর কোন জুলুম করিনি, বরং তারাই নিজেদের প্রতি অবিচার করেছে। কেননা, তারা নিজেদের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রক্ষাকর্তা প্রভুকে পরিত্যাগ করে নিজেদের মনগড়া হাতে তৈরি মূর্তিকে বা অন্য কিছুকে মা'বুদ সাব্যস্ত করেছে, যার ফলে আল্লাহ্‌র আযাব যখন নেমে এল, তখন ঐসব কাল্পনিক মা'বুদেরা তাদের কোন সাহায্য করতে পারল না। আর আল্লাহ্ তা'আলা যখন কোন জনপদবাসীকে আযাবের সাথে পাকড়াও করেন, তখন অত্যন্ত শক্ত ও নির্মমভাবে পাকড়াও করেন ; তখন আত্মরক্ষার জন্য কারো কোন গত্যন্তর থাকে না।

অতপর সবাইকে আখিরাতের চিন্তায় মশগুল করার জন্য ইরশাদ করেন যে, এসব ঘটনার মধ্যে ঐসব লোকের জন্য শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত ও নিদর্শনাবলী রয়েছে, যারা পরকালের আযাবকে ভয় করে। যেদিন সমগ্র মানব জাতি একই ময়দানে সমবেত হবে, সেদিনটি এতই ভয়াবহ যে, কোন ব্যক্তি আল্লাহ্‌র অনুমতি ছাড়া একটি শব্দও উচ্চারণ করতে পারবে না।

অতপর রসূলে করীম (সা)-কে সম্বোধন করে পুনরায় ইরশাদ করেছেন ঃ

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

অর্থাৎ—আপনি দীনের পথে দৃঢ়ভাবে সোজা চলতে থাকুন, যেভাবে আপনি আদিষ্ট হয়েছেন। আর যারা কুফরী হতে তওবা করে আপনার সাথী হয়েছে, তারাও সোজা পথে চলুক এবং আল্লাহ্ তা'আলার নির্ধারিত সীমারেখা অতিক্রম করবে না। কেননা, তিনি তোমাদের প্রতিটি কার্যকলাপ লক্ষ্য করেছেন।

ইস্তিকামতের তাৎপর্য, উপকারিতা ও মাসায়েল ঃ 'ইস্তিকামতে'র আসল অর্থ হচ্ছে, কোন দিকে একটু পরিমাণ না ঝুঁকে একদম সোজাভাবে দাঁড়িয়ে থাকা। বস্তুত এটা কোন সহজ কাজ নয়। কোন লৌহদণ্ড বা পাথরের থাম একজন সুদক্ষ প্রকৌশলী হয়ত এমনভাবে দাঁড় করাতে পারে, কিন্তু কোন প্রাণীর পক্ষে সর্বাবস্থায় সোজা দাঁড়িয়ে থাকা কত দুষ্কর তা কোন সাধারণ বোধসম্পন্ন ব্যক্তির অজানা নয়।

হযরত রসূলে করীম (সা) ও সকল মুসলমানকে তাদের সর্বকার্যে সর্বাবস্থায় ইস্তিকামত অবলম্বন করার জন্য অত্র আয়াতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

'ইস্তিকামত' শব্দটি ছোট হলেও এর অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। কেননা সর্বাবস্থায় সোজা দাঁড়িয়ে থাকার অর্থ হচ্ছে—আকাইদ, ইবাদত, লেনদেন, আচার-ব্যবহার, ব্যবসায়-বাণিজ্য, অর্থ উপার্জন ও ব্যয় তথা নীতি-নৈতিকতার যাবতীয় ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলার নির্ধারিত সীমারেখার মধ্যে থেকে তাঁরই নির্দেশিত সোজা পথে চলা। তন্মধ্যে কোন ক্ষেত্রে, কোন কার্যে এবং পরিস্থিতিতে গড়িমসি করা, বাড়াবাড়ি করা অথবা ডানেবামে ঝুঁকে পড়া ইস্তিকামতের পরিপন্থী।

দুনিয়ার যত গোমরাহী ও পাপাচার দেখা যায়, তা সবই ইস্তিকামত হতে সরে যাওয়ার ফলে সৃষ্টি হয়। আকাইদ অর্থাৎ ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ইস্তিকামত না থাকলে, মানুষ বিদ'আত হতে শুরু করে কুফরী ও শিরকী পর্যন্ত পৌঁছে যায়। আল্লাহ্ তা'আলার তওহীদ, তাঁর পবিত্র সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে হযরত রসূলে করীম (সা) যে সুষ্ঠু ও সঠিক মূলনীতি শিক্ষা দিয়েছেন, তার মধ্যে বিন্দুমাত্র হ্রাস-বৃদ্ধি বা পরিবর্ধন পরিবর্জনকারী পথভ্রষ্টরূপে আখ্যায়িত হবে, তা তার নিয়ত যতই ভাল হোক না কেন। অনুরূপভাবে নবী ও রসূল (আ)-গণের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধার যে সীমারেখা নির্ধারিত হয়েছে, সে ব্যাপারে ত্রুটি করা স্পষ্ট ধৃষ্টতা ও পথভ্রষ্টতা। তেমনি কোন রসূলকে আল্লাহ্র গুণাবলী ও ক্ষমতার মালিক বানিয়ে দেওয়াও চরম পথভ্রষ্টতা। ইহুদী ও খৃস্টানেরা এহেন বাড়াবাড়ির কারণেই বিভ্রান্ত ও বিপথগামী হয়েছে। ইবাদত ও আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ করার জন্য কোরআনে আযীম ও রসূলে করীম (সা) যে পথনির্দেশ করেছেন, তার মধ্যে কোনরূপ কমতি বা গাফলতি মানুষকে যেমন ইস্তিকামতের আদর্শ হতে বিচ্যুত করে। অনুরূপভাবে এর মধ্যে নিজের পক্ষ হতে কোন বাড়াবাড়ি বা পরিবর্ধনও মানুষকে বিদ'আতে লিপ্ত করে। সে কল্পনাবিলাসে বিভোর থাকে যে, আমি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি হাসিল করছি। অথচ সে ক্রমান্বয়ে আল্লাহ্ তা'আলার বিরাগভাজন হতে থাকে। এজন্যই হযরত রসূলে আকরাম (সা) স্বীয় উম্মতকে বিদ'আত ও নিত্য-নতুন সৃষ্ট প্রথা হতে অত্যন্ত জোরালভাবে নিষেধ করেছেন এবং বিদ'আতকে চরম গোমরাহী বলে অভিহিত করেছেন। অতএব, প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য হচ্ছে, যখন কোন কার্য সে আল্লাহ্ ও রসূল (সা)-এর সন্তুষ্টি লাভের জন্য ইবাদত হিসাবে করতে চায়, তখন কাজ করার আগে পূর্ণ তাহকীক করে জানতে হবে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর সাহাবায়ে কিরাম (রা) উক্ত কার্য ঐভাবে করেছেন কিনা? যদি না করে থাকেন, তবে উক্ত কাজে নিজের শক্তি ও সময়ের অপচয় করবে না।

অনুরূপভাবে আদান-প্রদান, স্বভাব-চরিত্র, আচার-ব্যবহার তথা জীবনের সর্ব-ক্ষেত্রে কোরআনে করীমে নির্দেশিত মূলনীতিগুলোকে রসূলে করীম (সা) বাস্তবে রূপায়িত করে একটি সুষ্ঠু-সঠিক মধ্যপন্থার পত্তন করেছেন। যার মধ্যে বন্ধুত্ব, শত্রুতা, ক্রোধ, ধৈর্য, মিতব্যয় ও দানশীলতা, জীবিকা উপার্জন, বৈরাগ্য সাধনা, আল্লাহ্র উপর নির্ভরতা, সম্ভাব্য চেষ্টা-তদ্বির করা, আবশ্যকীয় উপায়-উপকরণ সংগ্রহ করা এবং ফলাফলের জন্য আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহের প্রতি তাকিয়ে থাকা ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রে মুসলমানদেরকে এক নজীরবিহীন মধ্যপন্থা দেখিয়ে দিয়েছেন, তা পুরোপুরি অবলম্বন করেই মানুষ সত্যিকার মানুষ হতে পারে। এটা হতে বিচ্যুত হলেই সামাজিক বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। সারকথা, জীবনের সর্বক্ষেত্রে দীনের অনুশাসন মেনে চলাই ইস্তিকামতের তফসীর।

হযরত সুফিয়ান ইবনে আবদুল্লাহ্ সাকাফী (রা) রসূলুল্লাহ্ (সা) সমীপে আরয করলেন, "ইয়া রসূলাল্লাহ্ (সা)! ইসলাম সম্পর্কে আপনি আমাকে এমন একটি ব্যাপক শিক্ষা দান করুন, যেন আপনার পরে আমার কারো কাছে কিছু জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন

না হয়।" তিনি বললেন ঃ قُلْ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আন, অতপর ইস্তিকামত অবলম্বন কর।---(মুসলিম শরীফ ও তফসীরে কুরতুবী)

উসমান ইবনে হাযের আযদী বলেন---একবার আমি হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) সমীপে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলাম যে, "আপনি আমাকে একটি উপদেশ দান করুন।" তদুত্তরে তিনি বললেন ঃ عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللّٰهِ وَالْاِسْتِقَامَةِ اِتَّبِعْ وَلَا تَبْتَدِعْ অর্থাৎ তাকওয়া বা আল্লাহ্‌ভীতি ও ইস্তিকামত অবলম্বন কর, যার পন্থা হচ্ছে ধর্মীয় ব্যাপারে শরীয়তের অনুশাসন হুবহু মেনে চল, নিজের পক্ষ হতে হ্রাস-বৃদ্ধি করতে যেয়ো না।---(দারেমী ও কুরতুবী)

এ দুনিয়ায় ইস্তিকামতই সবচেয়ে দুষ্কর কার্য। এজন্যই বুযুর্গানে দীন বলেন যে, কারামতের চেয়ে ইস্তিকামতের মর্যাদা ঊর্ধ্বে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি সর্বকার্যে ইস্তিকামত অবলম্বন করে রয়েছে, যদি জীবনভর তাঁর দ্বারা কোন অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত না হয়, তথাপি ওলীগণের মধ্যে তাঁর মর্যাদা সবার ঊর্ধ্বে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, "পূর্ণ কোরআন পাকের মধ্যে অন্য আয়াতের চেয়ে কঠিন ও কষ্টকর কোন হুকুম্ রসূলে আকরাম (সা)-এর উপর নাযিল হয়নি।" তিনি আরো বলেন---একবার সাহাবায়ে কিরাম (রা) রসূলুল্লাহ্ (সা)-র দাড়ি মোবারকের কয়েক গাছি পাক ধরেছে দেখতে পেলেন, তখন আফসোস করে বললেন, আপনার দিকে দ্রুত গতিতে বার্ধক্য এগিয়ে আসছে। তদুত্তরে রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন---"সূরা হুদ আমাকে বৃদ্ধ করেছে।" সূরা হুদে বর্ণিত পূর্ববর্তী বিভিন্ন জাতির উপর কঠোর আযাবের ঘটনাবলীও এর কারণ হতে পারে। তবে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন---'ইস্তিকামতের' নির্দেশই ছিল বার্ধক্যের কারণ।

তফসীরে কুরতুবীতে হযরত আবূ আলী সিরী হতে বর্ণিত আছে যে, একবার তিনি স্বপ্নে রসূলে করীম (সা)-এর যিয়ারত লাভ করে জিজ্ঞেস করলেন---ইয়া রসূলাল্লাহ্ (সা), আপনি কি একথা বলেছেন যে, "সূরা হুদ আমাকে বৃদ্ধ করেছে?" তিনি বললেন 'হ্যাঁ'। পুনরায় প্রশ্ন করলেন---উক্ত সূরায় বর্ণিত নবী (আ)-গণের কাহিনী ও তাঁদের কওমসমূহের উপর আযাবের ঘটনাবলী কি আপনাকে বৃদ্ধ করেছে? তিনি জবাব দিলেন---'না'। বরং فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ ---"ইস্তিকামত অবলম্বন কর যেমন তোমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে" এ আয়াতেই আমাকে বৃদ্ধ করেছে।

একথা স্পষ্ট যে, রসূলে করীম (সা) পরিপূর্ণ মানুষের বাস্তব নমুনারূপে এ জগতে সুভাগমন করেছিলেন। ইস্তিকামতের উপর সুদৃঢ় থাকা ছিল তাঁর জন্মগত স্বভাব তথাপি অত্র নির্দেশকে এতদূর গুরুভার মনে করার কারণ এই যে, অত্র আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে শুধু সোজা পথে দৃঢ় থাকার নির্দেশ দিয়েই ক্ষান্ত হননি। বরং كَمَا أُمِرْتَ "যেভাবে আপনাকে আদেশ করা হয়েছে" বলে অতিরিক্ত শর্ত আরোপ করা হয়েছে। নবী ও রসূল (আ)-গণের অন্তরে অপরিসীম আল্লাহ্ভীতি প্রবল প্রভাবের কথা কারো অজানা নয়। তাই পূর্ণ ইস্তিকামতের উপর কায়েম থাকা সত্ত্বেও রসূলে পাক (সা) সর্বদা ভীত-সন্ত্রস্ত ছিলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা যেরূপ ইস্তিকামতের নির্দেশ দিয়েছেন, তা পুরোপুরি আদায় করা হচ্ছে কি না?

আরেকটি কারণ হতে পারে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) নিজের ইস্তিকামতের জন্য বিশেষ চিন্তিত ছিলেন না। কেননা আল্লাহ্র ফজলে তা পুরো মাত্রায় হাসিল ছিল। কিন্তু উক্ত আয়াতে সমগ্র উম্মতকে সোজা পথে সুদৃঢ় থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অথচ উম্মতের জন্য এটা অত্যন্ত কঠিন ও কষ্টকর। তাই রসূলুল্লাহ্ (সা) অতীব চিন্তিত ও শঙ্কিত ছিলেন।

ইস্তিকামতের আদেশদানের পর বলেন---وَلَا تَطْغَوْا "সীমালংঘন করো না। এটা طُغْيَانٌ শব্দ হতে গৃহীত। যার অর্থ সীমা অতিক্রম করা। এখানে সোজা পথে দৃঢ় থাকার আদেশ দান করেই শুধ্ ক্ষান্ত করা হয়নি। বরং এর নেতিবাচক দিকটিও স্পষ্টভাবে নিষেধ করা হয়েছে যে, আকাইদ, ইবাদত, লেনদেন ও নীতি-নৈতিকতার ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রসূল (সা)-এর নির্ধারিত সীমারেখা অতিক্রম করো না। কেননা, এটাই পার্থিব ও ধর্মীয় সর্বক্ষেত্রে বিপর্যয় ও ফাসাদের মূল কারণ।

১১৩ নং আয়াতে মানুষকে ক্ষতি ও ধ্বংস হতে রক্ষার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ঃ وَلَا تَرْكَنُوْا إِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ

অর্থাৎ—"ঐ সব পাপিষ্ঠের দিকে একটুও ঝুঁকবে না, তাহলে কিন্তু তাদের সাথে সাথে তোমাদেরকেও জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে।" 'লা-তারকানু' শব্দের মূল হচ্ছে رُكُوْن যার অর্থ "কোন দিকে সামান্যতম ঝোঁকা বা আকৃষ্ট হওয়া এবং তার প্রতি আস্থা বা সম্মতি জ্ঞাপন করা।" সুতরাং আয়াতের মর্ম হচ্ছে যে, পাপ-পঙ্কিলতায় লিপ্ত হওয়াকে তো সবাই ইহকাল ও পরকালের জন্য ক্ষতিকর বলে বিশ্বাস করেই; অধিকন্তু পাপিষ্ঠদের প্রতি সামান্যতম ঝুঁকে পড়া, আকৃষ্ট হওয়া, আস্থা বা মৌন সম্মতি জ্ঞাপন করাও সমান ক্ষতিকর।

এই ঝোঁকা ও আকর্ষণের অর্থ কি? এ সম্পর্কে সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেয়ীগণের কয়েকটি উক্তি বর্ণিত হয়েছে, যার মধ্যে পারস্পরিক কোন বিরোধ নেই। বরং প্রত্যেকটির উক্তিই নিজ নিজ ক্ষেত্রে শুদ্ধ ও সঠিক।

'পাপিষ্ঠদের প্রতি মোটেই ঝুঁকবে না' এ কথার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কাতাদা (র) বলেন, "পাপিষ্ঠদের সাথে বন্ধুত্ব করবে না, তাদের কথামত চলবে না।" হযরত ইবনে জুরাইয বলেন, "পাপিষ্ঠদের প্রতি আদৌ আকৃষ্ট হবে না।" হযরত আবুল আলিয়া (র) বলেন, "তাদের কার্যকলাপ ও কথাবার্তা পছন্দ করো না।" —(কুরতুবী) 'সুদ্দী' (র) বলেন, "তাদের অন্যায় কার্যে সম্মতি প্রকাশ বা নীরবতা অবলম্বন করবে না।" 'ইকরামা (র) বলেন—"তাদের সংসর্গে থাকবে না।" কাযী বায়যাবী (র) বলেন, "বাহ্যিক আকৃতি-প্রকৃতিতে, লেবাস-পোশাকে, চাল-চলনে তাদের অনুকরণও অত্র নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত।"

কাযী বায়যাবী (র) আরো বলেন—পাপাচার অনাচারকে নিষিদ্ধ ও হারাম ঘোষণা করার জন্য এখানে এমন কঠোর ভাষা প্রয়োগ করা হয়েছে, যার চেয়ে অধিকতর জোরাল ভাষা কল্পনা করা যায় না। কেননা, পাপিষ্ঠদের সাথে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব ও গভীর সম্পর্কই শুধু নিষেধ করা হয়নি, বরং তাদের প্রতি সামান্যতম আকৃষ্ট হওয়া, তাদের কাছে উপবেশন করা, তাদের কার্যকলাপের প্রতি মৌনতা অবলম্বনও নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

ইমাম আওযায়ী (র) বলেন—সমগ্র জগতে ঐ আলিমই আল্লাহ্ তা'আলার কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত ও অপছন্দনীয়, যে নিজের পার্থিব স্বার্থ উদ্ধারের জন্য কোন পাপিষ্ঠ ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করতে যায়।—(তফসীরে মাযহারী)

তফসীরে কুরতুবীতে বর্ণিত আছে যে, অত্র আয়াত দ্বারা বোঝা যায়—কাফির, মুশরিক, বিদ'আতী ও পাপিষ্ঠদের সংসর্গ হতে দূরে থাকা একান্ত কর্তব্য। বস্তুতপক্ষে মানুষের ভাল-মন্দ হওয়ার মধ্যে সংসর্গ ও পরিবেশের প্রভাবই সর্বাধিক। তবে একান্ত অপরিহার্য প্রয়োজনবশত অনন্যোপায় হয়ে তাদের কাছে যাওয়া জায়েয আছে।

হযরত হাসান বসরী (র) আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের দু'টি শব্দ সম্পর্কে বলেন—আল্লাহ্ তা'আলা সম্পূর্ণ দীনকে দু'টি لا হরফের মাঝে জমা করে দিয়েছেন। এক—لَا تَطْغَوْا সীমালংঘন করবে না, দ্বিতীয়—لَا تَرْكَنُوْا পাপিষ্ঠদের প্রতি ঝুঁকবে না। প্রথম আয়াতে শরীয়তের সীমারেখা অতিক্রম নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় আয়াতে খারাপ লোকদের সংস্পর্শে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। এটাই সমস্ত দীনদারীর সার সংক্ষেপ।

وَأَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ ۚ إِنَّ الْحَسَنٰتِ
يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ ۚ ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ ﴿١١٤﴾ وَاصْبِرْ فَإِنَّ
اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١١٥﴾ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُوْنِ

مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ يَّنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا
قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ ۚ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ
وَكَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿١١٦﴾ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ
وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴿١١٧﴾ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً
وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ﴿١١٨﴾ إِلَّا مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ ۗ
وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ
أَجْمَعِينَ ﴿١١٩﴾ وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ
بِهِ فُؤَادَكَ ۚ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٢٠﴾
وَقُلْ لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ ۗ إِنَّا عَامِلُونَ ﴿١٢١﴾
وَانْتَظِرُوا ۚ إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ﴿١٢٢﴾ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ
يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ۗ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا
تَعْمَلُونَ ﴿١٢٣﴾

(১১৪) আর দিনের দুই প্রান্তেই নামায ঠিক রাখবে, এবং রাতেরও প্রান্তভাগে; পুণ্য কাজ অবশ্যই পাপ দূর করে দেয়. যারা স্মরণ রাখে তাদের জন্য এটা এক মহা স্মারক। (১১৫) আর ধৈর্য ধারণ কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পুণ্যবানদের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না। (১১৬) কাজেই, তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলির মধ্যে এমন সৎকর্মশীল কেন রইল না, যারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে বাধা দিত; তবে মুষ্টিমেয় লোক ছিল যাদেরকে আমি তাদের মধ্য হতে রক্ষা করেছি। আর পাপিষ্ঠরা তো ভোগবিলাসে মত্ত ছিল—যার সামগ্রী তাদেরকে যথেষ্ট দেওয়া হয়েছিল। আসলে তারা ছিল মহা অপরাধী। (১১৭) আর তোমার পালনকর্তা এমন নন যে, জনবসতিগুলিকে অন্যায়-ভাবে ধ্বংস করে দিবেন, সেখানকার লোকেরা সৎকর্মশীল হওয়া সত্ত্বেও। (১১৮—১১৯) আর তোমার পালনকর্তা যদি ইচ্ছা করতেন, তবে অবশ্যই সব মানুষকে একই পথের পথিক করে দিতে পারতেন। তোমার পালনকর্তা যাদের উপর রহমত করেছেন, তারা বাদে সবাই চিরদিন মতভেদ করতেই থাকবে, এবং এজন্যই তাদেরকে সৃষ্টি

করেছেন। আর তোমার আল্লাহ্‌র কথাই পূর্ণ হল যে, অবশ্যই আমি জাহান্নামকে জিন ও মানুষ দ্বারা একযোগে ভর্তি করব। (১২০) আর আমি রসূলগণের সব কিছু বৃত্তান্তই তোমাকে বলছি, যা দ্বারা তোমার অন্তরকে মজবুত করছি। আর এভাবে তোমার নিকট মহাসত্য এবং ঈমানদারদের জন্য নসীহত ও স্মরণীয় বিষয়বস্তু এসেছে। (১২১) আর যারা ঈমান আনে না, তাদেরে বলে দাও যে, তোমরা নিজ নিজ অবস্থায় কাজ করে যাও, আমরাও কাজ করে যাই। (১২২) এবং তোমরাও অপেক্ষা করতে থাক, আমরাও অপেক্ষায় রইলাম। (১২৩) আর আল্লাহ্‌র কাছেই আছে আসমান ও যমীনের গোপন তথ্য; আর সকল কাজের প্রত্যাবর্তন তারই দিকে; অতএব, তারই বন্দেগী কর এবং তারই উপরে ভরসা রাখ, আর তোমাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালন কিন্তু বে-খবর নন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর [হে মুহাম্মদ (সা)], আপনি (সকাল-সন্ধ্যায়) দিনের দু'প্রান্তেই নামাযের পাবন্দী রাখুন এবং রাতেরও কিছু অংশে (নামাযের পাবন্দী রাখুন। কেননা,) নেক কাজ (আমলনামা হতে) পাপকে দূর করে দেয়, কোন সন্দেহ নেই। (নেক কাজের বদৌলতে গোনাহ্‌ মাফ করা হয়) এ কথাটি একটি (ব্যাপক) নসিহত, যারা নসিহত মেনে চলে তাদের জন্যে (যেহেতু প্রত্যেক নেক কাজ এই ব্যাপক নীতির অন্তর্ভুক্ত; অতএব, প্রতিটি নেক কাজের প্রতি উৎসাহিত-অনুপ্রাণিত হওয়া কর্তব্য)। আর (নসিহত অমান্যকারীদের পক্ষ থেকে যে দুর্ব্যবহার করা হচ্ছে, তার উপর) ধৈর্য ধারণ করুন। কেননা, আল্লাহ্‌ তা'আলা পুণ্যবানদের প্রতিদান কখনো বিনষ্ট করেন না। (সহনশীলতা ও ধৈর্য ধারণ করাও একটি গুরুত্বপূর্ণ সৎকার্য। সুতরাং তার পূর্ণ প্রতিদান আপনাকে দেয়া হবে। ইতিপূর্বে যেসব জাতির ধ্বংস কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, তার কারণ হচ্ছে যে,) তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহের মধ্যে এমন (দায়িত্বশীল) বিবেকবান লোক ছিল না, যারা (অন্যদেরকে কুফরী ও শিরকীর মাধ্যমে) দেশে (ফিতনা-ফাসাদ ও) বিপর্যয় সৃষ্টি করতে নিষেধ করত। তবে (মুষ্টিমেয়) কিছু লোক ছিল, (যারা নিজেরাও কুফরী ও শিরকী হতে দূরে ছিল এবং অন্যদেরকেও নিষেধ করেছিল। ফলে এ দু'টি কাজের বরকতে) তাদেরকে আমি অন্যদের (অর্থাৎ জাতির অন্যান্য লোকের) মধ্য হতে (নিরাপদে আযাব থেকে) রক্ষা করেছি। (অন্যেরা যেহেতু নিজেরাই কুফরী ও শিরকীতে লিপ্ত ছিল, সুতরাং অন্যকেও নিষেধ করেনি।) আর অবাধ্যরা তো ভোগ-বিলাসে মত্ত ছিল, যার (উপকরণ) সামগ্রীও তাদেরকে প্রচুর (পরিমাণে) দেওয়া হয়েছিল। (আসলে) তারা ছিল (অপকর্মে অভ্যস্ত) মহা-অপরাধী। (তাই কেউ পাপকার্য হতে বিরত হয়নি। নাফরমানীর ব্যাধিতে তারা ব্যাপকভাবে আক্রান্ত হয়েছিল। বাধা দিতে কেউ দণ্ডায়মান হল না। কাজেই সবাই একই আযাবের কবলে পতিত হয়ে ধ্বংস হল। অন্যথায় কুফরী ব্যাপক হওয়ায় এর শাস্তিও ব্যাপক হত। আর ফিতনা-ফাসাদ ব্যক্তি পর্যায়ে বলে এর শাস্তিও পাত্রভেদে হত। কিন্তু ফিতনা-ফাসাদে বাধা

না দেওয়ার কারণে যারা দুষ্কৃতকারী নয়, তাদেরকেও ফিতনা-ফাসাদের অংশীদার সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং সকলের উপর ঢালাওভাবে সমান আযাব নাযিল হয়েছে।) আর (তা একটি প্রমাণিত সত্য যে,) আপনার পালনকর্তা এমন নন যে, জনপদগুলিকে অন্যায়ভাবে ধ্বংস করে দেবেন, অথচ সেখানকার লোকেরা (নিজেদের ও অন্যদেরকে) সংশোধনরত। (বরং তারা যখন সংশোধনের পরিবর্তে ফিতনা-ফাসাদে লিপ্ত হয় এবং কেউ কাউকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে না, তখনই তারা ব্যাপক শাস্তির যোগ্য বিবেচিত হয়।) আর আপনার পালনকর্তা যদি ইচ্ছা করতেন, তবে অবশ্যই সব মানুষকে একই দলভুক্ত করে দিতে পারতেন। (অর্থাৎ সবাই ঈমানদার হত। কিন্তু কতিপয় বিশেষ রহস্যের কারণে তিনি এরূপ ইচ্ছা করেননি। অতএব, তারা দীনের বিরোধিতায় বিভিন্ন মতাবলম্বী হয়ে গেছে) এবং ভবিষ্যতেও তারা চিরদিন বিরোধিতা করতে থাকবে। তবে আপনার প্রতিপালক যাদের উপর রহমত করেছেন, (তারা কখনো দীনের বরখেলাফ পথ অবলম্বন করবে না। আর তাদের বিরোধিতার কারণে আপনি দুঃখিত, চিন্তিত বা বিস্মিত হবেন না। কেননা,) এহেন (বিরোধিতা করার) জন্যই (আল্লাহ্ তা'আলা) তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। আর (বিরোধিতা করার জন্য সৃষ্টি করার হেতু হচ্ছে) আপনার আল্লাহ্র (এ) কথা পূর্ণ হবে যে, আমি অবশ্যই জাহান্নামকে জিন ও ইনসান দ্বারা একযোগে বোঝাই করব। (কারণ অনুগতদের প্রতি যেমন রহমত প্রকাশ করা বান্ছনীয়। অবাধ্যদের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করাও তদ্রূপ বান্ছনীয়। পাত্রভেদে রহমত ও অসন্তোষ প্রকাশ করা বান্ছনীয় কেন? তার নিগূঢ় রহস্য একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন। মোটকথা আল্লাহ্ তা'আলার অসন্তুষ্টি জাহির করার জন্য কিছু লোকের দোযখে যাওয়া আবশ্যক। জাহান্নামে গমনের জন্য কিছু লোকের কাফির থাকা প্রয়োজন। আর কাফির থাকার জন্য দীনের বিরোধিতা অপরিহার্য। সবাই মু'মিন না হওয়ার এটাই রহস্য ও তাৎপর্য।) আর পয়গাম্বরগণের কাহিনী হতে আমি (পূর্বোক্ত) সবকিছু বৃত্তান্তই আপনাকে বলছি, যা দ্বারা আপনার অন্তরকে মজবুত করছি। (এটা হল কাহিনী বর্ণনার একটি ফায়দা অর্থাৎ আপনাকে সান্ত্বনা দান করাই অন্যতম উদ্দেশ্য।) আর এ কাহিনীগুলিতে আপনার নিকট (অকাট্য) মহাসত্য এসেছে, (এবং) ঈমানদারদের জন্য (পাপকার্য হতে বিরত হওয়ার) উপদেশ ও (সৎকার্য) স্মরণ করিয়ে দেওয়ার বিষয়বস্তু রয়েছে। [এটা হল কাহিনী বর্ণনা করার দ্বিতীয় ফায়দা। প্রথমটি নবী (সা)-র জন্য আর দ্বিতীয়টি তাঁর উম্মতের জন্য।] আর (এতসব অকাট্য দলীল-প্রমাণ সত্ত্বেও) যারা ঈমান আনে না, তাদেরে বলে দিন (যে, আমি তোমাদের সাথে তর্ক করতে চাই না,) তোমরা নিজ (নিজ অবস্থায়) কাজ করে যাও, আমরাও (নিজেদের পথে) কাজ করে যাচ্ছি। অতপর (নিজ নিজ কার্যকলাপের প্রতিফলের জন্য) তোমরাও অপেক্ষা করতে থাক, আমরাও প্রতীক্ষায় রইলাম (অচিরেই হক ও বাতিল স্পষ্ট হয়ে যাবে)। আর আসমান ও যমীনের (যাবতীয়) গোপন তথ্য আল্লাহ্ তা'আলার কাছেই রয়েছে। (পক্ষান্তরে বান্দাদের কার্যকলাপ তো প্রকাশ্য জিনিস। কাজেই আল্লাহ্ তা'আলা ভাল করেই তা অবহিত রয়েছেন।) আর সকল কাজের শেষ গতি তাঁরই কাছে; (তিনি সবকিছু জানেন, সব কিছু করতে পারেন।

কাজেই সর্বকাজের পুরস্কার বা শাস্তি তিনি অনায়াসে দিতে পারেন।) অতএব, [হে মুহাম্মদ (সা)] আপনি তাঁরই বন্দেগী করুন, (তবলীগ করাও ইবাদত-বন্দেগীর অন্তর্ভুক্ত)। এবং (তবলীগের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যদি কোনরূপ কষ্ট-ক্লেশ, ভয়-ভীতির সম্মুখীন হন তাহলে) তাঁরই উপর ভরসা রাখুন; [মাঝখানে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে লক্ষ্য করে দু'টি কথা বলার পর পুনরায় পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরে গেছেন।] আর তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে আপনার পালনকর্তা বে-খবর নন (যেমন পূর্ববর্তী বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

রসূলে পাক (সা)-এর মাহাত্ম্যের প্রতি ইঙ্গিত ঃ সূরা হুদে পূর্ববর্তী নবীগণ ও তাঁদের জাতিসমূহের দৃষ্টান্তমূলক ঘটনাবলী বর্ণনা করার পর নবীয়ে-করীম (সা) ও উম্মতে মুহাম্মদীকে কতিপয় হিদায়ত দেওয়া হয়েছে। পূর্বোল্লিখিত فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ আয়াত হতে যার ধারাবাহিকতা শুরু হয়েছে।

কোরআন পাকের অপূর্ব বাচনভঙ্গি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ও শিক্ষাপ্রদ। এখানে যেসব আদেশ প্রদান করা হয়েছে, তাতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সরাসরি সম্বোধন করা হয়েছে এবং উম্মতকে পরোক্ষভাবে উক্ত হুকুমের আওতায় আনা হয়েছে। যেমন ঃ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ "আপনি সোজা পথে দৃঢ় থাকুন, যেমন আপনাকে আদেশ করা হয়েছে এবং যারা তওবা করে আপনার সাথী হয়েছে তারাও সোজাপথে চলতে থাকবে।" (১১২ নং আয়াত) ১১৪ নং আয়াতে وَأَقِمِ الصَّلٰوةَ 'আপনি নামায কায়েম রাখুন।' ১১৫তম আয়াতে وَاصْبِرْ "আপনি ধৈর্য ধারণ করুন" ইত্যাদি। পক্ষান্তরে যেসব কাজে নিষেধ করা হয়েছে এবং তা হতে দূরে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সে ক্ষেত্রে সরাসরি উম্মতকে সম্বোধন করা হয়েছে। যেমন ১১২তম আয়াতে وَلَا تَطْغَوْا "আর তোমরা সীমালংঘন করবে না", ১১৩ নং আয়াতে وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا "এবং তোমরা পাপীদের প্রতি ঝুঁকবে না" বলা হয়েছে।

অনুসন্ধান করলে সমগ্র কোরআন মজীদে সাধারণত একই বাচনভঙ্গি পরিলক্ষিত হবে যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে আদেশ করা হয়েছে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে উদ্দেশ্য করে এবং নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে উম্মতের প্রতি সম্বোধন করে। এর মাধ্যমে রসূলে করীম (সা)-এর মাহাত্ম্য ও উচ্চ মর্যাদা প্রকাশ করা হয়েছে যে, নিন্দনীয় যত কার্য আছে, রসূলে পাক (সা) নিজেই তা বর্জন করে থাকেন। আল্লাহ্ তা'আলাই তাঁকে এমন স্বভাব-প্রকৃতি দান করেছেন যে, কোন নিন্দনীয় প্রবৃত্তি বা পাপকার্যের প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্র আকর্ষণ হয় না। এমনকি ইসলামের প্রাথমিক যুগে যেসব জিনিস জায়েয ও হালাল ছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে তা হারাম ও নিষিদ্ধ হওয়া আল্লাহ্ তা'আলার জানা ছিল; রসূলে পাক (সা) জীবনে কখনো সেগুলোর কাছেও যাননি। যেমন মদ, সূদ, জুয়া প্রভৃতি।

১১৪তম আয়াতে রসূলে করীম (সা)-কে লক্ষ্য করে তাঁকে ও তাঁর সমস্ত উম্মতকে নামায কায়েম রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উলামায়ে-তফসীর, সাহাবী ও তাবেয়ীগণ একমত যে, আলোচ্য আয়াতে সালাত অর্থ ফরয নামায, (বাহরে মুহীত ও তফসীরে কুরতুবী) এবং ইকামতে সালাত অর্থ পূর্ণ পাবন্দীর সাথে নিয়মিতভাবে নামায আদায় করা। কোন কোন আলিমের মতে নামায কায়েম করার অর্থ সমুদয় সুন্নত ও মুস্তাহাবসহ নামায আদায় করা। কারো মতে এর অর্থ মুস্তাহাব ওয়াক্তে নামায পড়া أَقِمِ الصَّلٰوةَ এর তফসীর প্রসঙ্গে উপরোক্ত তিনটি উক্তি পাওয়া যায়। মূলত এটা কোন মতানৈক্য নয়। বস্তুত আলোচ্য সবগুলোই ইকামতে সালাতের সঠিক মর্মার্থ।

নামায কায়েম করার নির্দেশ দানের পর ইজমালীভাবে নামাযের ওয়াক্ত বর্ণনা করেছেন যে, "দিনের দু'প্রান্তে অর্থাৎ শুরুতে ও শেষভাগে এবং রাতেরও কিছু অংশে নামায কায়েম করবে।" দিনের দু'প্রান্তের নামাযের মধ্যে প্রথম ভাগের নামায সম্পর্কে সবাই একমত যে, এটা ফজরের নামায। কিন্তু শেষ প্রান্তের নামায সম্পর্কে কেউ বলেন—তা মাগরিবের নামায। কেননা দিন সম্পূর্ণ শেষ হওয়া মাত্র মাগরিবের নামায পড়া হয়। কেউ কেউ আসরের নামাযকেই দিনের শেষ নামায সাব্যস্ত করেছেন। কেননা তাই দিনের সর্বশেষ নামায। মাগরিবের ওয়াক্ত দিনের অংশ নয়। বরং দিন সমাপ্ত হওয়ার পর রাতের প্রথম প্রান্তে মাগরিবের নামায পড়া হয়। زُلَفًا শব্দ বহুবচন, তার একবচন زُلْفَةٌ যার অর্থ হচ্ছে অংশ বা টুকরা زُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ অর্থাৎ রাতের কিছু অংশের নামায সম্পর্কে হযরত হাসান বসরী, মুজাহিদ, মুহাম্মদ ইবনে কা'ব, কাতাদা, যাহ্হাক প্রমুখ অধিকাংশ তফসীরকারের অভিমত হচ্ছে যে, এটা মাগরিব ও ইশার নামায। হাদীসেও এর সমর্থন পাওয়া যায়, যাতে ইরশাদ হয়েছে যে, زلفا من الليل মাগরিব ও ইশার নামায। তফসীরে ইবনে কাসীর অনুসারে

طَرَفَيِ النَّهَارِ অর্থ ফজর ও আসরের নামায এবং যে, زُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ অর্থ মাগরিব ও ইশার নামায। অতএব অত্র আয়াতে চার ওয়াক্ত নামাযের বর্ণনা পাওয়া গেল। অবশিষ্ট রইল জোহরের নামায। তার ওয়াক্ত সম্পর্কে কোরআন পাকের অন্য আয়াতে বলা হয়েছে ঃ أَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ "নামায কায়েম কর, যখন সূর্য ঢলে পড়ে।"

আলোচ্য আয়াতে নামায কায়েম করার নির্দেশদানের সাথে সাথে তার উপকারিতাও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে ঃ إِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ— অর্থাৎ "পুণ্যকার্য অবশ্যই পাপকে মিটিয়ে দেয়।" শ্রদ্ধেয় তফসীরকারগণের মতে এখানে পুণ্যকার্য বলতে নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, সদকাহ, সদ্ব্যবহার, উত্তম লেনদেন প্রভৃতি যাবতীয় পুণ্যকার্য বোঝান হয়েছে। তবে তন্মধ্যে নামায সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও সর্বাগ্রগণ্য। অনুরূপভাবে পাপকার্যের মধ্যে সগীরা ও কবীরা যাবতীয় গোনাহ্ শামিল রয়েছে। কিন্তু কোরআন মজীদের অন্য এক আয়াত এবং রসূলে করীম (সা)-এর বিভিন্ন হাদীস দ্বারা বোঝা যায় যে, এখানে পাপকার্য দ্বারা সগীরা গোনাহ্ বোঝান হয়েছে। এমতাবস্থায় আয়াতের মর্ম হচ্ছে, যাবতীয় নেক কাজ বিশেষ করে নামায সগীরা গোনাহ্সমূহ মিটিয়ে দেয়। কোরআনে করীমে ইরশাদ হয়েছে ঃ إِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَاۤئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ অর্থাৎ তোমরা যদি বড় (কবীরা) গোনাহ্সমূহ হতে বিরত থাক—যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে, তাহলে আমি তোমাদের ছোট ছোট (সগীরা) গোনাহ্গুলি মিটিয়ে দেব।

মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে, রসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন যে, পাঞ্জেগানা নামায এবং এক জুম'আ হতে পরবর্তী জুম'আ পর্যন্ত এবং এক রমযান হতে পরবর্তী রমযান পর্যন্ত মধ্যবর্তী যাবতীয় (সগীরা) গোনাহ মিটিয়ে দেওয়া হয়, যদি সে ব্যক্তি কবীরা গোনাহ্ হতে বিরত থাকে। অর্থাৎ কবীরা গোনাহ্ তো তওবা ছাড় মাফ হয় না, কিন্তু সগীরা গোনাহ্ নামায, রোযা, দান-খয়রাত ইত্যাদি পুণ্যকার্য করার ফলে আপনা-আপনিও মাফ হয়ে যায়। তবে 'বাহরে মুহীত' নামক তফসীরে উসূল শাস্ত্রের মুহাক্কিক আলিমগণের অভিমত উল্লেখ করা হয়েছে যে, পুণ্যকার্যের ফলে সগীরা গোনাহ্ মাফ হওয়ার পূর্বশর্ত হচ্ছে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে স্বীয় কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত ও লজ্জিত হতে হবে, ভবিষ্যতে গোনাহ্ না করার সংকল্প থাকতে হবে এবং একই গোনাহে বারবার লিপ্ত না হওয়ার দৃঢ় সংকল্প থাকতে হবে। অন্যথায় সগীরা গোনাহ্ মাফ হবে না। হাদীস শরীফের যেসব রেওয়ায়েতে গোনাহ্ মাফ হওয়ার সুসংবাদ দেওয়া

হয়েছে, সেখানে সর্বত্র একই পাপকার্যে বারবার লিপ্ত না হওয়া, স্বীয় কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হওয়া ও ভবিষ্যতে তা হতে দূরে থাকতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়ার শর্ত রয়েছে। واللہ اعلم

হাদীস শরীফের প্রসিদ্ধ রেওয়ায়েতসমূহে নিম্নবর্ণিত কার্যগুলিকে কবীরা গোনাহ্ বলা হয়েছেঃ (১) আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্র সত্তা অথবা গুণাবলীর মধ্যে অন্য কাউকে অংশীদার বা সমকক্ষ সাব্যস্ত করা। (২) শরীয়তসম্মত ওজর ছাড়া ইচ্ছাকৃতভাবে কোন ফরয নামায ছেড়ে দেওয়া। (৩) কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা। (৪) ব্যভিচার করা। (৫) চুরি করা। (৬) মদ্য পান করা। (৭) মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া। (৮) মিথ্যা কসম করা। (৯) মিথ্যা সাক্ষী দান করা। (১০) যাদু করা। (১১) সূদ খাওয়া। (১২) অবৈধভাবে ইয়াতীমের মাল আত্মসাৎ করা। (১৩) জিহাদের ময়দান হতে পলায়ন করা। (১৪) সতী নারীর উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা। (১৫) অবৈধভাবে অন্যের সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়া। (১৬) অঙ্গীকার ভঙ্গ করা। (১৭) আমানতের মাল খেয়ানত করা। (১৮) অন্যায়ভাবে কোন মুসলমানকে গালি দেওয়া। (১৯) কোন নিরপরাধ ব্যক্তিকে অপরাধী সাব্যস্ত করা ইত্যাদি। কবীরা ও সগীরা গোনাহ্সমূহ সবিস্তারে বর্ণনা করে উলামায়ে কিরাম সহস্র কিতাব প্রণয়ন করেছেন। আমার লেখা 'গোনাহে বে-লজ্জত' বা বেহুদা গোনাহ্ কিতাবে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে।

মোটকথা, আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে প্রমাণিত হল যে, নেক কাজ করার ফলেও অনেক গোনাহ্ মাফ হয়ে যায়। তাই রসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেছেন যে, "তোমাদের থেকে কোন মন্দ কাজ হলে পরে সাথে সাথে নেক কাজ কর, তাহলে তার ক্ষতি পূরণ হয়ে যাবে।" তিনি আরো বলেছেন যে, মানুষের সাথে হাসিখুশি ব্যবহার কর। —(মুসনাদে আহমদ ও তফসীরে ইবনে-কাসীর)

হযরত আবু যর গিফারী (রা) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সা) সমীপে আরয করলাম যে, "ইয়া রসূলাল্লাহ্ (সা)! আপনি আমাকে একটি উপদেশ দান করুন।" তদুত্তরে তিনি বললেন—যদি তোমার থেকে কোন গোনাহ্র কাজ হয়ে যায় তবে পরক্ষণেই কোন নেক কাজ কর, তাহলে গোনাহ্ মিটে যাবে।

প্রকৃতপক্ষে এসব হাদীসে গোনাহ্ হতে তওবা করার সুন্নত তরীকা ও প্রশংসনীয় পন্থা বাতলে দেওয়া হয়েছে। যেমন—মুসনাদে আহমদে হযরত আবু বকর সিদ্দীকে আকবর (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন, "যদি কোন মুসলমান কোন পাপকার্য করে বসে তবে ওযূ করে তার দু'রাকাত নামায পড়া উচিত। তাহলে উক্ত গোনাহ্ মাফ হয়ে যাবে।" অত্র নামাযকে তওবার নামায বলে (উপরোক্ত রেওয়ায়েতসমূহ তফসীরে ইবনে-কাসীর হতে গৃহীত)।

ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ - এখানে ذٰلِكَ অর্থাৎ 'ইহা' শব্দ দ্বারা কোরআন মজীদের প্রতি ইঙ্গিত হতে পারে অথবা ইতিপূর্বে বর্ণিত বিধি-নিষেধের প্রতিও

ইশারা হতে পারে। সে-মতে আয়াতের মর্ম হচ্ছে—এই কোরআন পাক অথবা তাতে বর্ণিত হুকুম-আহকামসমূহ ঐসব লোকের জন্য স্মরণীয় হিদায়ত ও নসীহত, যারা উপদেশ শুনতে ও মানতে প্রস্তুত। এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, জেদী হঠকারী লোক যারা নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে কোন কথা চিন্তা-বিবেচনা করতে সম্মত নয়, তারা সুপথ হতে বঞ্চিত থাকে।

وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ অর্থাৎ "আপনি সবর অবলম্বন করুন, ধৈর্য ধারণ করুন, অবিচল থাকুন। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা সৎকর্মশীলদের প্রতিদান কখনো বিনষ্ট করেন না।"

'সবর' শব্দের আভিধানিক অর্থ বাঁধা, বন্ধন করা। স্বীয় প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখাকেও সবর বলে। সৎকার্য সম্পাদনের লক্ষ্যে স্বীয় প্রবৃত্তিকে অবিচল রাখা এবং পাপকার্য হতে দমন রাখাও সবরের অন্তর্ভুক্ত। এখানে রসূলে আকরাম (সা)-কে 'সবর' অবলম্বন ও ধৈর্য ধারণ করার নির্দেশদানের এক উদ্দেশ্য হতে পারে যে, আলোচ্য আয়াতে আপনাকে ইস্তিকামত ও নামায কায়েম করা ইত্যাদি যেসব হুকুম দেওয়া হয়েছে, আপনি তার উপর দৃঢ়ভাবে কায়েম থাকুন। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হচ্ছে, ধর্মদ্রোহীদের বিরুদ্ধাচরণ ও জুলুম-নির্যাতনে ধৈর্যাবলম্বন করুন। অতপর ইরশাদ হয়েছে, "নিশ্চয়, আল্লাহ্ তা'আলা সৎকর্মশীলদের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না।" এখানে স্পষ্টত 'মুহসিনীন' বা সৎকর্মশীল শব্দ ঐসব লোকের উপর প্রযোজ্য হবে যারা আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত বিধি-নিষেধের পূর্ণ অনুসারী, অর্থাৎ ধর্মীয় ব্যাপারে ইস্তিকামতের উপর কায়েম, শরীয়তের সীমারেখা পরিপূর্ণ বজায় রেখে চলেন। পাপিষ্ঠ জালিমদের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্ব বা অহেতুক সম্পর্ক রাখেন না, নামাযকে সুষ্ঠু ও নিখুঁতভাবে আদায় করেন এবং শরীয়তের যাবতীয় অনুশাসন দৃঢ়তার সাথে মেনে চলেন।

মোটকথা, মুহসিনীনদের দলভুক্ত হতে হলে এমনভাবে সৎকার্য করতে হবে, যা স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সা) 'ইহসান' শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য ও ইবাদত এমনভাবে করবে, যেন তুমি আল্লাহ্কে দেখছ অথবা অন্তত এতটুকু ধারণা করবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই তোমাকে দেখছেন। আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্র সত্তা ও মহান গুণাবলী সম্পর্কে যখন কোন ব্যক্তির এ পর্যায়ের প্রত্যয় হাসিল হবে, তখনকার যাবতীয় কার্যকলাপই সুষ্ঠু ও সুন্দর হওয়া অবশ্যম্ভাবী। পূর্ববর্তী উলামায়ে কিরামের মধ্যে তিনটি বাক্য বিশেষ প্রচলিত ছিল, যা তাঁরা প্রায়শই একে অপরকে লিখে পাঠাতেন। বাক্য তিনটি স্মরণ রাখা একান্ত বান্ছনীয়। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে, যে ব্যক্তি আখিরাতের কাজে মগ্ন হয়, আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং তার পার্থিব কাজগুলি অনায়াসলব্ধ এবং সু-সম্পন্ন করে দেন। দ্বিতীয় বাক্য হচ্ছে—যে ব্যক্তি তার অন্তরকে ঠিক রাখবে অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া সব কিছুকেই অন্তর হতে বের করে দিয়ে অন্তরকে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার দিকে আকৃষ্ট করবে, আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং তার বাহ্যিক অবস্থা ভাল করে

দেবেন। তৃতীয় বাক্য হচ্ছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার সাথে তার সম্পর্ক ঠিক রাখবে, তার সাথে অন্য সকলের সম্পর্ক আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং ঠিক করে দেবেন। সেই তিনটি বাক্যের মূল হলো ঃ وَكَانَ اَهْلُ الْخَبَرِ يَكْتُبُ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ بِثَلَاثِ كَلِمَاتٍ، مَنْ عَمِلَ لِاٰخِرَتِهٖ كَفَاهُ اللّٰهُ اَمْرَ دُنْيَاهُ، وَمَنْ اَصْلَحَ سَرِيْرَتَهٗ اَصْلَحَ اللّٰهُ عَلَانِيَتَهٗ وَمَنْ اَصْلَحَ فِيْمَا بَيْنَهٗ وَبَيْنَ اللّٰهِ اَصْلَحَ اللّٰهُ مَا بَيْنَهٗ وَبَيْنَ النَّاسِ (রূহুল বয়ান, ২য় জিলদ ১৩১ পৃঃ)

১১৬ ও ১১৭তম আয়াতে পূর্ববর্তী জাতিগুলির উপর আযাব নাযিল হওয়ার কারণ বর্ণনা করে মানুষকে তা হতে আত্মরক্ষার পথ নির্দেশ করা হয়েছে। ইরশাদ করেছেন ঃ "আফসোস, পূর্ববর্তী ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসমূহের মধ্যে দায়িত্বশীল বিবেকবান কিছু লোক কেন ছিল না? যারা জাতিকে ফাসাদ সৃষ্টি করা হতে বিরত রাখত, তাহলে তো তারা সমূলে ধ্বংস হত না। তবে মুষ্টিমেয় কিছু লোক ছিল, যারা নবী (আ)-গণের যথার্থভাবে অনুসরণ করেছে এবং তারা আযাব হতে নিরাপদ ছিল। অবশিষ্ট লোকেরা পার্থিব ভোগবিলাসে মত্ত হয়ে অপকর্মে মেতে উঠেছিল।"

অত্র আয়াতে সমঝদার বিবেকসম্পন্ন লোকদেরকে اُولُوْا بَقِيَّةٍ বলা হয়েছে। بَقِيَّةٍ অবশিষ্ট বস্তুকে বলে। মানুষ তার সবচেয়ে প্রিয় ও পছন্দনীয় বস্তু নিজের জন্য সঞ্চয় ও সংরক্ষণ করতে অভ্যস্ত। প্রয়োজনের মুহূর্তে অন্য সব জিনিস হাতছাড়া করেও তা ধরে রাখার চেষ্টা করে। এ জন্যই বিবেক-বিবেচনা ও দূরদর্শিতাকে بقية বলা হয়। কেননা, তা সর্বাধিক প্রিয় ও মূল্যবান সম্পদ।

১১৭তম আয়াতে ইরশাদ করেছেন যে, "আপনার পালনকর্তা জনপদগুলিকে অন্যায়ভাবে নিপাত করেন নি এমতাবস্থায় যে, তার অধিবাসীরা সৎকর্মশীল ও আত্ম-সংশোধনরত ছিল।" এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে অন্যায় অবিচারের কোন আশংকা নেই। যেসব জাতিকে ধ্বংস করা হয়, তারা প্রকৃতপক্ষেই নিপাতযোগ্য অপরাধী।

কোন কোন তফসীরকারের মতে অত্র আয়াতে ظلم জুলুম অর্থ শিরকী এবং مصلحون অর্থে ঐ সব লোক যারা কাফির-মুশরিক হওয়া সত্ত্বেও তাদের লেনদেন,

আচার-ব্যবহার, নীতি-নৈতিকতা ভাল। যারা মিথ্যা কথা বলে না, ধোঁকাবাজি করে না, কারো কোন ক্ষতি করে না। সে-মতে অত্র আয়াতের অর্থ হচ্ছে, শুধু কাফির বা মুশরিক হওয়ায় দুনিয়ায় কোন জাতির উপর আল্লাহ্‌র আযাব অবতীর্ণ হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা নিজেদের কার্যকলাপ ও চাল-চলন দ্বারা পৃথিবীতে ফিতনা-ফাসাদ ও অশান্তি সৃষ্টি না করে। পূর্ববর্তী যতগুলি জাতি ধ্বংস হয়েছে তাদের বিশেষ বিশেষ অপকর্মই তজ্জন্য দায়ী। হযরত নূহ (আ)-র জাতি তাঁকে বিভিন্ন প্রকার কষ্ট-ক্লেশ দিয়েছিল, হযরত শোয়াইব (আ)-এর দেশবাসী ওজনে-পরিমাপে হেরফের করে দেশে অশান্তি সৃষ্টি করেছিল, হযরত লূত (আ)-এর কওম জঘন্য যৌন অপকর্মে অভ্যস্ত হয়েছিল, হযরত মূসা ও ঈসা (আ)-র কওমের লোকেরা নিজেদের নবীগণের প্রতি অন্যায়-অত্যাচার করেছিল। তাদের এ সব কার্যকলাপই দুনিয়ায় তাদের উপর আযাব নাযিল হওয়ার মূল কারণ। শুধু কুফরী বা শিরকীর কারণে দুনিয়ায় আযাব আপতিত হয় না। কেননা, তার শাস্তি তো দোযখের আগুনে চিরকাল ভোগ করবে। এজন্যই কোন কোন আলিমের অভিমত হচ্ছে যে, কুফরী ও শিরকীতে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও দুনিয়াতে রাজত্ব বাদশাহী করা যেতে পারে, কিন্তু অন্যায়-অবিচারে লিপ্ত হওয়ার পর তা বজায় থাকতে পারে না।

মতবিরোধ ঃ নিন্দনীয় ও প্রশংসনীয় দিক ঃ ১১৮তম আয়াতে ইরশাদ করা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা যদি ইচ্ছা করেন তবে সকল মানুষকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করতে পারেন। তাহলে সবাই মুসলমান হয়ে যেত, কোন মতভেদ থাকত না। কিন্তু নিগূঢ় রহস্যের প্রেক্ষিতে আল্লাহ্‌ তা'আলা এ দুনিয়াতে কাউকে কোন কাজের জন্য বাধ্য করবেন না, বরং তিনি মানুষকে অনেকটা ইখতিয়ার দান করেছেন, যার ফলে মানুষ ভালমন্দ পাপ-পুণ্য উভয়টাই করতে পারে। মানুষের মন-মানসিকতা বিভিন্ন হওয়ার কারণ তাদের মত ও পথ ভিন্ন ভিন্ন হয়েছে। ফলে সর্ব যুগেই কিছু লোক সত্য-ন্যায়ের বিরোধিতা করে আসছে। তবে যাঁদের উপর আল্লাহ্‌ তা'আলা খাস রহমত করেছেন অর্থাৎ যাঁরা সত্যিকার-ভাবে নবীগণের শিক্ষাকে অনুসরণ করেছেন তাঁরা কখনো সত্য-বিচ্যুত হননি।

আলোচ্য আয়াতে যে মতবিরোধের নিন্দা করা হয়েছে, তা হচ্ছে—নবীগণের শিক্ষা ও সত্য দীনের বিরোধিতা করা। পক্ষান্তরে উলামায়ে-দীন ও মুজতাহিদ আলিমগণের মধ্যে যে মতভেদ সাহাবায়ে কিরামের যুগ হতে চলে আসছে, তা আদৌ নিন্দনীয় এবং আল্লাহ্‌র রহমতের পরিপন্থী নয়। বরং তা একান্ত অবশ্যম্ভাবী, সাধারণ মুসলমানদের জন্য কল্যাণকর এবং আল্লাহ্‌র রহমতস্বরূপ। অত্র আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে যারা মুজতাহিদ ইমাম ও ফকীহগণের মতভেদকে বিভ্রান্তিকর ও ক্ষতিকর আখ্যা দিয়েছে, তাদের উক্তি অত্র আয়াতের মর্ম এবং সাহাবী ও তাবেয়ীগণের আমলের পরিপন্থী।

و الله سبحانه و تعالى اعلم

ইফাবা—৯১-৯২—প্র/১৪৮৪ (উ)—৫২৫০

যাদের সহযোগিতায় প্রশ্নাবলি-
সংগৃহীত হয়েছে, দয়া করে তাদের পরিবারের
মঙ্গলের জন্য একটু দোয়া করবেন)